নীলাম্বরী

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

বার আনা

নীলাম্বরী

সূচী

যাঁহার প্রীতির জন্য এই ক্ষুদ্র

গল্পগুলি লিখিত

এবং

যাঁহার সনির্বন্ধ অনুরোধে

এই বিক্ষিপ্ত পল্লবগুলি

একত্র

গ্রথিত হইল,

তাঁহারই করকমলে

সমর্পণ করিলাম।

নীলাম্বরী

আমি নীলাম্বরী সুন্দরী বড় ভালবাসি। একটি নীলাম্বরী সুন্দরীকে দেখিব, ইহা আমার জীবনের সাধ। মানুষের কত বিচিত্র আশা থাকে, আমার সমগ্র জীবনের আকাঙ্ক্ষা ঐ একটি সাধে কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল। আমার গুণই বল, আর দোষই বল, যৌবনের উন্মেষ হইতেই আমি কবি কীট্‌সের মত রূপের উপাসক। সেইজন্য আমার রুচি সাধারণ লোকের রুচির সহিত বড়-একটা মিশিত না। কিন্তু তাহাতে কি আসে-যায়? আমাকে এই রুচির জন্য অনেক সময়ে বন্ধুবান্ধবের বিদ্রূপবাণ সহ্য করিতে হইত, কিন্তু পরিশেষে সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেন যে, আমার রুচির বিশেষত্ব আছে, এবং এইরূপ পরিমার্জ্জিত রুচির জন্য, আমি এ পর্য্যন্ত কোন কবিতা না লিখিলেও বন্ধুমহলে আমার 'কবি'-আখ্যা হইয়াছিল। কবিতা ও কবিত্ব এক জিনিষ নহে, কাহারও ভাগ্যে কবিতা, কাহারও ভাগ্যে কবিত্ব, কদাচিৎ কাহারও ভাগ্যে বা উভয়ের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। আমার ভাগ্যে কবিতা ঘটে নাই, শ্লাঘ্যতর কবিত্ব ঘটিয়াছিল। যাহা হউক, আমার কবিত্বময়ী কল্পনা নীলাম্বরী সুন্দরীকে কেন্দ্র

করিয়া এক অপূর্ব্ব কুহেলিকাময় বৃত্ত অঙ্কিত করিয়াছিল। আমার সমগ্র জীবন যেন তাহাতেই নিমগ্ন ছিল। বন্ধুদিগের মধ্যে আমার এই অতৃপ্ত সাধটী অপ্রকাশিত ছিল না। আমি যখন তাঁহাদের নিকট কল্পনালোকদুর্লভ অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যময়ী নীলাম্বরপরিহিতা কোন সুন্দরী রমণীর চিত্র উদ্ঘাটিত করিতে করিতে উদ্দীপনায় কণ্টকিত হইয়া উঠিতাম, তখন আমার বোধ হইত, যেন তাঁহাদের মনেও আমার বাসনার প্রতিধ্বনি জাগাইয়া তুলিয়াছি।

সৌন্দর্য্যের উপাসনা কখন নিন্দনীয় হইতে পারে না। বরং উহা মানসিক উৎকর্ষেরই পরিচায়ক,—যাহাকে ইংরেজিতে বলে Æsthetic Culture। এই কারণেই আমার আকাঙ্ক্ষাটি কাহারও নিকটে গোপন করা প্রয়োজনীয় বোধ করি নাই। আর আমার সমস্ত হৃদয় পূরিয়া গিয়াছিল ঐ এক ছবিতে—নীলাম্বরী সুন্দরী। চম্পকগৌরকান্তি, নিটোল নিচোল সুঠাম, নিবিড়কৃষ্ণ-জলদজালতুল্য কেশরাশি জলরাশিনীল বসনে আসিয়া মিশিয়াছে, আর তাহার মধ্য হইতে গোলাপদলপেলব বাহুলতা ঈষৎ উন্নমিতভাবে অশোকশাখার দিকে প্রসারিত হইয়াছে! অতুলনীয় এ চিত্র! কোন্ নন্দনকাননে, নির্ঝরিণীগীতে আমার এই চিরসুরভি পারিজাত ফুটিয়াছে, কোন্ পরীরাজ্যে আমার এই মানসপ্রতিমা অম্লানমধুরিমায় বিভোর হইয়া আছে! মনে পড়ে, বৈষ্ণবকবির সেই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যসৃষ্টি। যখন যমুনার কূলে কনকবর্ণা গোপবধূ

নীলাম্বরে সাজিয়া কামিনীকুঞ্জে গ্রীবা হেলাইয়া বিরাজ করিতে-ছেন, তখন রাজনীতিপণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণের মস্তিষ্কের অবস্থাও কল্পনা করিবার যোগ্য বটে! এইরূপ মস্তিষ্কের জন্যই পরিশেষে তিনি ব্যবস্থা করিলেন—দেহি পদপল্লবমুদারম্। বৈষ্ণবকবি যে অমর সৌন্দর্য্যের চিত্র আঁকিয়া গিয়াছেন, কখন সেরূপ মূর্ত্ত সৌন্দর্য্য দেখিয়া নয়ন সার্থক করিতে পারিয়াছিলেন কি না, জানি না—কিন্তু আমার বোধ হইল, যেন আমার এ আশা অপূর্ণই থাকিয়া যাইবে। কাব্যে কত সুন্দরীর চিত্র, চিত্রে কত জীবিতোপম অনির্ব্বচনীয় রূপ দেখিয়াছি, কিন্তু হায়, বাস্তবে কি তাহার কিছুই মিলে না! কবিকে জিজ্ঞাসা করিলে কবি বলিবেন, সৌন্দর্য্যের আদর্শ যেদিন নয়নগোচর হইবে, সেদিন সে যে "আদর্শ"-পদবী হইতে স্খলিত। চিত্রকর হয় ত মস্তক কণ্ডূয়ন করিবেন; কিন্তু আমার মন তাহাতে প্রবোধ মানিবে না। একান্ত আকাঙ্ক্ষার সহিত যাহা এতদিন হৃদয়ে পোষণ করিলাম, তাহা কাল্পনিক,—তাহা অলীক? তুমি কবি, তুমি চিত্রকর, তোমার ইচ্ছা হয় বল—কারণ তুমি ত আমার মত এমন সর্ব্বগ্রাসী সৌন্দর্য্যাভিলাষের প্রভাব জীবনের পরতে-পরতে অনুভব কর নাই। তুমি বলিতে পার, কিন্তু আমার হৃদয় তাহা মানিবে না। আমি বিশ্ব খুঁজিয়া খুঁজিয়া কেবল নিষ্ফলতাই লাভ করিয়াছি, কিন্তু আমার বিশ্বাস তাহাতে শিথিল হয় নাই। বাধা পাইয়া পাইয়া আমার আশা

বাসনায়, বাসনা ব্যগ্রতায় এবং ব্যগ্রতা ক্রমে অধৈর্য্যে পরিণত হইয়াছিল। প্রথম বাধা পাইলাম বিবাহে। সকলের যেমন আশা থাকে যে, বিবাহের শুভদৃষ্টি এক অভিনব সৌন্দর্য্যরাজ্যের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দিবে, আমারও তাহাই ছিল। এবং সকলের মত আমাকেও নিরাশ হইয়া ফিরিতে হইয়াছিল। আমার স্ত্রী শ্যামবর্ণা। (সম্পাদকমহাশয়, অনুগ্রহ করিয়া লেখকের নামের স্থলে শুধু "শ্রী", "বিসর্গ" ও ছোটরকমের একটি "ড্যাশ্" দিয়া দিতে বলিবেন। দেখিবেন, যেন ভুলিয়া আমার নাম ছপান না হয়। আর এ সংখ্যার "বঙ্গদর্শন" আমাকে আদৌ পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। আমি ক্লবে গিয়া পড়িয়া আসিব।) সুতরাং আমার আশা মিটিল না। আমার স্ত্রীর নিকট আমার কিছুই গোপনীয় ছিল না। আমি যখনই আমার কল্পনার মৌলিকসৃষ্টি নীলাম্বরী সুন্দরীর কথা তাঁহার নিকট পাড়িতাম, তখনই তিনি হঠাৎ গম্ভীর হইয়া পড়িতেন। আমি বুঝিতাম—স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা। কিন্তু আমার সে সব ভাবিবার সময় ছিল না। আমার হৃদয় সেই একই চিন্তায় ভরপুর। কাহার কোথায় একটু আঘাত লাগিল, তাহা দেখিবার বড় অবকাশ ছিল না। আমার স্ত্রী মাঝে মাঝে তাঁহার জন্য একখানি নীলরঙের পার্শী-শাড়ী আনিবার জন্য বলিতেন। কিন্তু আমি সে কথা শুনিয়াও শুনিতাম না। আমার সে মানসী প্রতিমা শুভ্র শারদজোছনার ন্যায়

সুন্দরী; নীলাম্বর তাহারই শোভে। তাহার একটা দীন মলিন অভিনয় করিতে আমার প্রবৃত্তি হইত না। কিন্তু একদিন বড় অনর্থ ঘটিল।

আমার স্ত্রী তাঁহার এক নবাগত বন্ধুর ভবনে নিমন্ত্রণরক্ষা করিয়া বাড়ী ফিরিতে "রাত্রি করিয়া" ফেলিয়াছেন। সেজন্যও বটে ও গ্রীষ্মাতিশয্যহেতুও বটে, আমার মেজাজের উষ্ণতা সাড়ে-অষ্টানব্বই অতিক্রম করিয়াছিল। তার পর যখন তিনি তাঁহার সইএর কানের ইয়ারিং হইতে তদীয় ময়নার প্রগল্‌ভতা পর্য্যন্ত সমস্ত বিষয়ের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলেন, তখন আমি হাই তুলিয়া প্রকাশ্যভাবে অন্যমনস্ক হইতে লাগিলাম। হঠাৎ আমার স্ত্রী বলিলেন, "নলিনী (তাঁহার বন্ধু) একখানা আশমানীরঙের শাড়ী পরিয়াছিল, তাহাকে এমন মানাইয়াছিল, সে আর কি বলিব?"

আমি এবার তাঁহার বর্ণনায় আগ্রহের সহিত মনোনিবেশ করিলাম। মনে করিলাম, এমন রুচি আমারই শিক্ষার ফল। না হইবে কেন? স্ত্রী হইতেছেন—"প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।" আমার আগ্রহ বোধ হয় তাঁহার বুঝিতে বাকি রহিল না। বলিলেন, "আমি কতদিন বলিয়াছি একখানা নীল পার্শী শাড়ীর জন্য; আর বলিব না।"

আমি তাঁহার সে অপ্রচ্ছন্ন অভিমানে প্রশ্রয় না দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার বন্ধুটি বোধ হয় খুব ফর্শা হইবেন?"

"কেন, তাহার ত বিবাহ হইয়া গেছে, সে খবর জানিয়া আর লাভ হইবে কি?"

"কি আশ্চর্য্য! বিবাহ না করিলে বুঝি কাহারও চেহারার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতে নাই!"

"ভবানীবাবু (নলিনীর স্বামী) কাল তোমাকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিবেন, সেখানে গেলেই দেখিতে পাইবে।"

"ভবানীবাবু কলিকাতায় আসিবার পর একবার তাঁহার বাড়ীতে গিয়াছি, কিন্তু তাঁহার স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই।—তার পর তোমার বন্ধুর রং ফর্শা কি না, বলিলে না?"

"উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ।"

আমার ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিত হইয়া আসিল, আমার স্ত্রীর সৌন্দর্য্য-জ্ঞান সম্বন্ধে প্রথমটা যেমন সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম, তেমনই নিরাশ হইতে হইল। বলিলাম, "দেখ, শ্যামবর্ণের সঙ্গে নীলরঙের শাড়ী মানাইতে পারে না। যদি চাঁপাফুলের মত রং হয়, পটলচেরা—"

আমার স্ত্রী বাধা দিয়া বলিলেন, "যাহারা নীল শাড়ী পরে, সবাই বুঝি ডানাকাটা পরী?"

বাধা না মানিয়া বলিতে লাগিলাম, "পটলচেরা চোখ হয়, সর্ব্বাবয়বের গঠনে বেশ স্বাস্থ্য ও সামঞ্জস্য থাকে—"

"এইরূপ একটি দেখিয়া বিবাহ করিলেই ত চুকিয়া যাইত।"

"দেখ, আমার কথার অর্থ তুমি ঠিক বুঝিতে পার নাই।

বিবাহ করার কথা কে বলিতেছে? বিবাহ যেমন-তেমন হইলেই হয়, আদর্শটা—"

"যেমন-তেমন লইয়া থাকিবার প্রয়োজন কি?" অলঙ্কার-শিঞ্জিতে আমার উপচীয়মান বক্তৃতার উচ্ছ্বাস নিমজ্জিত করিয়া দিয়া তিনি দ্রুতপদে কক্ষান্তরে গমন করিলেন।

পরদিন প্রাতে চা-এর টেবিলে ভবানীবাবুর নিমন্ত্রণ পাইলাম। অতি প্রত্যূষে, ঈষৎ গোলাপীরঙের সুপ্রসর মলমলের চাদরে তাঁহার স্থূলদেহ আপাদস্কন্ধ আবৃত করিয়া ভবানীবাবু ধীর-পদসঞ্চারে আমার কক্ষে প্রবেশ করিয়াই একেবারে একখানা চেয়ার টানিয়া তাহাতে উপবিষ্ট হইলেন। আমি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া তাঁহার সংবর্দ্ধনার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। কিন্তু আমি উঠিবার পূর্ব্বেই তাঁহার আসনপরিগ্রহ করা হইয়া গিয়াছে। সুতরাং কেবল উচ্চহাস্য করিয়া তিনি আমার অপ্রতিভভাবের সমালোচনা করিলেন।

চা-পান শেষ হইলে ভবানীবাবু বলিলেন, "আজ সন্ধ্যায় আমার ওখানে আপনি আহার করিবেন। দেখিবেন, যেন ভুলিবেন না।" এই বলিয়া তিনি পকেট হইতে দেশলাই ও চুরুট বাহির করিয়া অতি যত্নপূর্ব্বক চুরুটে অগ্নিসংযোগ করিলেন ও কিছুক্ষণের জন্য ধূমপানে তন্ময় হইলেন।

"সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বেই যাইবেন। দু'একবাজি দাবা খেলা

যাইবে। দু'একখানা গানও শোনা যাইতে পারিবে। আর নেহাৎ কিছু না হয়, দুজনে খানিক চিৎপাত হইয়া পড়িয়া থাকাও ত যাইবে? কিছুক্ষণ আড্ডা দেওয়া বই ত নয়। আমার বোধ হয়, মাঝে মাঝে বন্ধুবান্ধবে মিলিয়া ঐরূপ একএকটা স্যান্ধ্যসমিতি বা আড্ডার জোগাড় করিলে মন্দ হয় না—যাহাতে সকলে মিলিয়া একটা বিস্তৃত ফরাসের উপর একএকটি তাকিয়া লইয়া স্রেফ্ চুপচাপ পড়িয়া থাকা যায়। অবশ্য রঙ্গালয়ে ধূমপান নিষিদ্ধ নহে। সময়টা বেশ কাটিয়া যায়—বুঝেচেন গোপালবাবু, বেশ বেমালুম কাটিয়া যায়।"

এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া ভবানীবাবু তাঁহার অনাদৃত অপরিসমাপ্ত চুরুটের কুণ্ডলীকৃত ধূমপুঞ্জে কিছুক্ষণের জন্য মন ও মুখমণ্ডলকে যুগপৎ নিমজ্জিত করিয়া দিলেন।

ভবানীবাবু বড় অমায়িক লোক। স্বভাবটি অতি সুন্দর। একবার পরিচয় হইলে, সহজে তাঁহাকে ভুলিতে পারা যায় না। তাঁহার হৃদয় সর্ব্বদাই যেন উন্মুক্ত—কৃত্রিমতার ব্যবধান সেখানে কোন সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেয় নাই। এই সকল কারণে অল্প পরিচয়েই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম।

অন্য কথাবার্ত্তার পর তিনি বিদায়গ্রহণ করিলেন। যাইবার সময় বলিলেন, "দেখিবেন, যেন দিনের কাজের গোলযোগে নিমন্ত্রণের বিষয় ভুলিয়া যাইবেন না। এ নিমন্ত্রণটা আমার গৃহিণীর পক্ষের, সুতরাং অত্যন্ত জরুরি।"

আমি বলিলাম, "শরীর ভাল থাকিলে—"

ভবানীবাবু "ঈশ্বরেচ্ছায়, ঈশ্বরেচ্ছায়" বলিতে বলিতে সহাস্য-মুখে বাহির হইয়া গেলেন।

সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে ভবানীবাবুর গৃহে উপস্থিত হইলাম। তাঁহার ছোটখাটো বৈঠকখানার মেজেয় সতরঞ্চ ও চাদরের ফরাশ। তদুপরি বিভিন্ন আয়তনের গোটাকয়েক তাকিয়া অধিকার করিয়া কয়েকটি বাবু একটি ছোটখাটো-রকমের মজলিস সাজাইয়া বসিয়া আছেন। আমি যাইবামাত্র তাঁহারা "আস্‌তে আজ্ঞে হোক্," "বস্‌তে আজ্ঞে হোক্" ইত্যাদি সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিতে করিতে আমাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। তাঁহারা সকলেই ভবানীবাবুর প্রতিবেশী, আমার আসিবার পূর্ব্বেই তাঁহারা আমার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভবানীবাবু একে একে সকলের সহিত আমার পরিচয় করিয়া দিলেন।

আমি আমার কোঁচানো চাদরটি সন্তর্পণের সহিত একটি তাকিয়ার উপর রক্ষা করিয়া অতি বিনীতভাবে উপবেশন করিলাম। চাকর আসিয়া সুবৃহৎ আল্‌বোলায় তামাক দিয়া তাহার নলটি আমার দিকে যত্নপূর্ব্বক প্রসারিত করিয়া দিয়া গেল। কিন্তু "ও রসে বঞ্চিত দাসগোবিন্দ।" কাজেই নলটাকে তুলিয়া বেচারামবাবুর দিকে দিলাম। তিনি ধন্যবাদসূচক মৃদু-হাস্য করিয়া বলিলেন, "আপনি বুঝি ওতে নাই? অতি উত্তম।"

আমি চাহিয়া দেখিলাম, আর সকলের সতৃষ্ণদৃষ্টি ঐ নলটির উপরেই ছিল।

"এস হে ভায়া, একবাজি হোক্"—বলিতে বলিতে ভবানীবাবু দাবার বন্ধন উন্মোচন করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসীবাবু বলিলেন, "দাবা ত রোজই হয়, আজ গোপালবাবুর একআধখানা গান শোনা যাক্।"

বেচারামবাবু বলিলেন, "গোপালবাবু গাইতে পারেন বটে? বেশ, বেশ!"

আমি গ্রীবা হেলাইয়া বলিলাম, "আজ্ঞে না!"

আর "আজ্ঞে না!" আগুন যেমন ভস্মঢাকা থাকে না, গুণও তেমনই বেশীক্ষণ চাপা থাকে না। বিশেষত যারা গান গাইতে জানে, তাদের ঐ "আজ্ঞে না" বলিবার ধরণই স্বতন্ত্র; অপরের পক্ষে বুঝিতে বেশী বিলম্ব হয় না। ভবানীবাবু তাঁহার প্রায়োন্মোচিত দাবা পুনরায় বন্ধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে সন্ন্যাসীবাবু আমার সম্মতির অপেক্ষা না করিয়া একটি এস্‌রাজ—যাহা এতক্ষণ আমার অজ্ঞাতসারে গৃহকোণে বিরাজ করিতেছিল—আনিয়া হাজির করিলেন এবং কালোয়াতদিগের ন্যায় একখানি জানুর উপর ভর দিয়া উপবেশন করিয়া সজোরে এস্‌রাজের অসংখ্য কর্ণ মর্দ্দনপূর্ব্বক বিচিত্র সুর বাহির করিতে লাগিলেন। সুরের দফায় আমার বিশেষ ব্যুৎপত্তি আছে বলিয়া খ্যাতি ছিল না। তবে

আমার গলা খুব দরাজ; স্বর "বাজখাঁই" বলিয়া অনেকের পছন্দ হইত না বটে, কিন্তু আমার বোধ হয় পুরুষমানুষের কণ্ঠস্বর বামাকণ্ঠবিনিন্দিত হওয়া অত্যাবশ্যক নহে।

বহুক্ষণ পরে এস্‌রাজের সুর বাঁধা হইল। ছড়িটা দ্রুত-সঞ্চালিত হইয়া সুরতরঙ্গে ক্ষুদ্র বৈঠকখানাগৃহটি প্লাবিত করিয়া দিল। বেচারামবাবু অতি গদ্গদভাবে বলিলেন, "এইবার গোপাল-বাবু আমাদের কৃতার্থ করুন।" আমি কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত প্রতিবাদ করিলাম। কিন্তু যখন গবাক্ষান্তরালে বলয়ের ধ্বনি শুনিতে পাইলাম, তখনই মন স্থির করিয়া ফেলিলাম। স্ত্রীজাতির সমক্ষে, বিশেষতঃ আমার গৃহিণীর বন্ধুর সমক্ষে, যে-কোন উপায়েই হউক, আমাকে সম্মানরক্ষা করিতেই হইবে। সুতরাং আর ইতস্ততঃ না করিয়া গান ধরিয়া দিলাম। এস্‌রাজের সুরের সঙ্গে সুর মিশিল না বলিয়া সন্ন্যাসীবাবু একটু আপত্তি করিলেন, কিন্তু আমি তাহা লক্ষ্য না করিয়াই গাহিয়া চলিলাম। গানটি করুণরসাত্মক, গভীরভাবপূর্ণ, জড়জগতের নশ্বরত্বপ্রতিপাদক। "শেষের সে দিন মন, কর রে স্মরণ, ভবধাম যবে ছাড়িবে।" উদারা, মুদারা, তারা, তিন গ্রাম অতিক্রম করিয়া আমার সুর ছুটিয়া চলিল। শ্রোতৃমণ্ডলী নিস্তব্ধভাবে গানটি আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিলেন। গান সাঙ্গ হইলে সকলে উচ্চহাস্য করিয়া আমাকে অভিনন্দন করিলেন। সন্ন্যাসীবাবু এস্‌রাজটি ফরাশের উপর প্রলম্বিত করিয়া

কিছুদূরে সরিয়া বসিলেন। আমি আবার একটি গান মনে করিতে লাগিলাম। দুঃখের বিষয়, আমার গানের মধ্যেই ভবানীবাবু দাবা বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন, এখন সকলে গিয়া সেই দাবার কোট ঘিরিয়া বসিলেন। আমি আর গান গাহিবার অবকাশ পাইলাম না।

দাবাখেলার পর আর সকলে বিদায়গ্রহণ করিলেন এবং ভবানীবাবু অলসভাবে তাকিয়ার আশ্রয় লইলেন। কিছুক্ষণ পরেই চাকর আসিয়া খবর দিল, "খাবার দেওয়া হয়েচে।" আমরা তাহার অনুবর্ত্তী হইলাম। আহারের সময় আমার স্ত্রীর বন্ধু,—ভবানীবাবুর পত্নী—বিশেষ যত্ন সহকারে আমার তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। তিনি আমার গানের প্রশংসা করিলেন। আমি তাঁহার যত্ন ও অভ্যর্থনায় মুগ্ধ হইলাম।

আহারের পর ভবানীবাবুর শয়নকক্ষে গিয়া আমি বসিলাম। ভবানীবাবু তামাকুর অন্বেষণে বাহির হইলেন। আমি একখানি বেতের চেয়ারে উপবিষ্ট ছিলাম। ভবানীবাবুর স্ত্রী টেবিলের কাছে দাঁড়াইয়া আমার সহিত কথা কহিতেছিলেন। টেবিলের উপরে Hinks-এর double burner আলো, ঘরটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। দেয়ালের গায়ে রবিবর্ম্মার ছবি। ঘরের একদিকে বড় একখানা খাট ও তার উপর শুভ্রশয্যা আস্তৃত।

ভবানীবাবুর স্ত্রী শ্যামবর্ণা। গঠন দোহারা এবং মন অতি

নির্ম্মল ও প্রফুল্ল। তাঁহার চোখে, মুখে ও ললাটে আনন্দের চাপল্য যেন সর্ব্বদাই বিরাজ করিতেছে। রন্ধনে, পরিবেষণে ও যত্ন-অভ্যর্থনায় তাঁহার মত খুব কমই দেখা যায়।

ভবানীবাবুর স্ত্রী বলিতেছিলেন, আহারের সেরূপ আয়োজন করিতে পারেন নাই, ইত্যাদি।

আমি আগ্রহের সহিত তাহার প্রতিবাদ করিতেছিলাম, "যথেষ্ট আয়োজন হইয়াছে, আবার কি করিতে হইবে?" ইত্যাদি।

তিনি বলিলেন, "যাক্ সে কথা, আবার কবে আসিতেছেন বলুন? সেদিন কিন্তু সরোজিনীকে লইয়া আসিবেন।" আমি নানাপ্রকার কাজের ওজর জানাইতেছিলাম, এমনসময় তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'ঐ যা, আপনাকে পান দিতে ভুলিয়াছি। বিনু, ও বিনু, গোপালবাবুর পান দিয়ে যা।"

সহসা থিয়েটারের পট অপসারিত হইলে দর্শকমণ্ডলী ক্ষণ-কালের নিমিত্ত যেমন বিস্ময়বিহ্বল হইয়া থাকে, আমার নয়ন-সমক্ষে যে দৃশ্য সহসা উদ্ঘাটিত হইল, তাহাতে আমিও তেমনই বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়া পড়িলাম। নাতিকৃশাঙ্গী, রোচনাগৌরকান্তি, উচ্ছলিত-লাবণ্য-হিল্লোলচঞ্চলা অথচ যৌবনোন্মেষলাজমন্থরা, স্রস্তনীলাঞ্চলবিজিতধীরচরণা, চতুর্দ্দশবর্ষীয়া একটি বালিকা আমার সম্মুখে! আমার চক্ষু ঝলসিয়া গেল। আমার হৃদয়ে নীলাম্বরী

রমণীর যে আদর্শমূর্ত্তি গড়িতেছিল দেহপরিগ্রহ করিয়া আমার সেই মানসী প্রতিমা আমার সম্মুখে বিরাজমানা। আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছিলাম? আমি ভুলিয়া গেলাম যে কোথায় আমি! ভুলিয়া গেলাম, সে ঘরে অপর কাহারও অস্তিত্ব। কল্পনা তাহার তুষারকণসম্পৃক্ত, দিগন্তপ্রসারিত পক্ষপুটের উপর আমাকে উঠাইয়া-লইয়া যেন কোথায় উধাও হইয়া চলিল—যেন বহুদূরে—বহু—বহুদূরে। আমার আবেগ সর্ব্বশরীর ব্যাপিয়া-ব্যাপিয়া মাদকসুলভ উন্মাদনায় আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। আমার চঞ্চলতা ভবানীবাবুর স্ত্রীর বুঝিতে বাকী রহিল না। তিনি মৃদুহাস্যের সহিত বলিলেন, "গোপালবাবু, অবাক্ হইয়া রহিলেন যে, পান খান্!" তাঁহার কণ্ঠস্বরে আমার চৈতন্য হইল। মনে করিলাম, তাই ত, "মায়া স্বিদেষা মতিবিভ্রমো নু!" নবাগতা আমার সম্মুখে টেবিলের উপরে তাম্বূলপাত্র রক্ষা করিয়া ভবানী-বাবুর স্ত্রীর নিকটে গিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহার কুঞ্চিত অলকদাম উচ্ছৃঙ্খলভাবে ললাটস্পর্শ করিয়া দুলিতেছিল। তাঁহার অনিন্দ্য গৌরবর্ণ নীলাম্বর ভেদ করিয়া আলোকসম্পর্কে যেন কম্পিত হইতেছিল। আমি দেখিলাম—এ যে আমারই কল্পনার নীলাম্বরী।

আমি আদেশপালনের মত একটি পান লইয়া খুঁটিতে লাগিলাম। ভবানীবাবুর স্ত্রী বলিলেন, "এটি আমার ভগ্নী। বিনু, তুই গোপালবাবুকে নমস্কার করিস্ নি?"

বিনোদিনী তাঁহার শরীরযষ্টি ঈষৎ হেলাইয়া আমাকে নমস্কার করিলেন। আমি সর্ব্বান্তকঃরণে তাঁহাকে প্রতিনমস্কার করিলাম। ভবানীবাবুর স্ত্রী বলিলেন, "আপনার সহিত কত লোকের আলাপ পরিচয় আছে, একটি পাত্র সস্তায় মিলাইয়া দিতে পারেন? মেয়ের বয়স হইয়াছে, আর রাখা যায় না।" একটি অর্দ্ধপরিস্ফুট হাস্য কষ্টে চাপিয়া বিনোদিনী কক্ষ হইতে ছুটিয়া পলাইলেন।

পরে আর যে কি কথা হইল, তাহা সব আমার কর্ণে পৌঁছিল না। কারণ, আমি অন্যমনস্ক হইয়া ভাবিতেছিলাম—সেই নীলাম্বরী সুন্দরী।

সেইদিন হইতে একপ্রকার বিষাদপূর্ণ অলসতা আমাকে অধিকার করিয়া ফেলিল। কার্য্যে আর প্রবৃত্তি নাই, জীবনে আর সুখ নাই, আশায় আর মোহ নাই, এখন চিন্তাতেই কেবল সুখ, মরণেই শান্তি বলিয়া মনে হয়। বুঝিলাম, অনঙ্গদেব এতদিন ভুলিয়া থাকিয়া অবশেষে এই বেচারীর প্রতি তাঁহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিতেছেন। আমার চোখে কেবল সেই রূপের মোহ, আর কানে বাজিতেছিল ভবানীবাবুর গৃহিণীর কথা— "সস্তায় একটি পাত্র মিলাইয়া দিতে পারেন কি?" আমার মনে হইতেছিল—"ভাল, আমি যদি বিনোদিনীর পাণিপ্রার্থী হই, তাহা হইলে কি হয়?" এ প্রস্তাবে যে কেহ অসম্মত হইতে পারেন, তাহা আমার বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইল না। আমা-

দের "ঘরে" মিল আছে, তার পর, অন্যে যাহাই মনে করুন না, আমার নিজের রূপগুণসম্বন্ধে আমার মন্দ ধারণা ছিল না। কাহারই বা থাকে? তবে এক কথা এই, "দোজো" বর এবং পূর্ব্বপক্ষ বর্ত্তমান। তা সস্তায় হইতে গেলে অমন একটু-আধটু অসুবিধা স্বীকার করিতেই হয়। বলিতে কি, আমি সেই অবধি মনে মনে বিনোদিনীকে বিবাহ করিবার চিন্তা ও প্রকাশ্য-ভাবে হিন্দুধর্ম্ম, কৌলিন্য প্রথা তদন্তর্গত বহুবিবাহের প্রশংসা করিতে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিলাম। আমার স্ত্রীর নিকটে পর্য্যন্ত কথায় কথায় বলিলাম যে, আমার মাসিমা মৃত্যুকালে বলিয়া গিয়াছিলেন—"বাবা, আমার মাথা খাও, সংবৎসরের মধ্যে যদি বৌমার ছেলেপিলে না হয়, তবে তুমি আবার বিবাহ করিও।" বিনোদিনীর কথা পাড়িতে সাহস হইল না।

ভবানীবাবুর গৃহে আরও দুই তিনবার গিয়াছি কিন্তু একবারও বিনোদিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নাই। আমাকে দেখিয়া ভবানীবাবুর স্ত্রী মুখ টিপিয়া-টিপিয়া হাসিতেন। তিনি কি কিছু বুঝিতে পারিয়াছিলেন? স্ত্রীজাতির সর্ব্বজ্ঞত্বে আমার বিশ্বাস আছে।

বাড়ীতে আমার স্ত্রীর সংসর্গ আমার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু আমার স্ত্রী তাহাতে কাতর হওয়া দূরে থাকুক, বরং অধিকতর প্রফুল্ল হইতেন। বস্তুত তাঁহার হাস্যো-জ্জ্বল দৃষ্টি আমাকে ব্যথিত করিত।

ভবানীবাবু সপ্তাহখানেক বাদে আমাকে আবার নিমন্ত্রণ করিলেন। এবার সস্ত্রীক নিমন্ত্রণ। যথেষ্ট সাজসজ্জা করিয়া একখানি সেকেণ্ডক্লাসের গাড়িতে খড়্‌খড়ি রুদ্ধ করিয়া ভবানী-বাবুর দ্বারে উপনীত হইলাম। গাড়িতে আমার স্ত্রীর দৃষ্টি ও বাক্যালাপ যথাসম্ভব এড়াইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম।

ভবানীবাবুর বৈঠকখানায় আজ দাবার খুব ধুম। আমি একটি তাকিয়া অধিকার করিয়া বসিলাম। দাবার আসর হইতে অবিরাম যে বাদপ্রতিবাদের কলরব উঠিতেছিল, তাহা আমার বিরক্তিকর বোধ হইতেছিল। বৈঠকখানার উজ্জ্বল আলোক আমার পক্ষে অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। কখন অদৃশ্য ঈথিরীয় জগতের মধ্যে বিচরণ করিয়া, কখন রাস্তায় শকটের সঞ্চারিণী দীপশিখা দেখিয়া, কখন বা হাই তুলিয়া আমার সময় কাটিতেছিল।

অন্য সকলেই ধূমপানের আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন। আমার পক্ষে একটা-কিছু ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য বোধে ভবানীবাবু ডাকিয়া বলিলেন—"ওরে, এঁকে পান দিয়ে যা। বেচারামবাবু ব্যস্তসমস্তভাবে হুঁকার নলটি আমার দিকে বাড়াইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু আমার মস্তকহেলনে হস্ত সঙ্কুচিত করিয়া বলিলেন,—"ওঃ, আপনি ত ওতে নাই, বেশ! বেশ!"

একটি সুস্থ সবল গৌরবর্ণ বালক পান দিয়া গেল। বালক-

টির মুখখানি বিনোদিনীর মত স্নিগ্ধ ও সরল, কিন্তু তত পূর্ণ নহে। মস্তকে কুঞ্চিত কেশভার, গায় একটি ওয়েষ্টকোট্‌মাত্র। আমার স্ত্রীর নিকট শুনিয়াছিলাম যে, ভবানীবাবুর একটি ভাই আছে। কিন্তু ইহাকে দেখিয়া বিনোদিনীর ভাই অর্থাৎ ভবানী-বাবুর শ্যালক বলিয়াই মনে হয়। একবার তাহাকে কাছে ডাকিতে বড় ইচ্ছা হইল, কিন্তু তাহার নাম জানি না, সুতরাং সঙ্কোচবোধ করিলাম।

কিছুক্ষণ পরে চাকর আসিয়া বলিল, "খাবারের জায়গা হয়েচে।" বেচারামবাবু তাঁহার স্বাভাবিক গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "উত্তম, উত্তম!" ভবানীবাবু বলিলেন, "যাও, যাচ্চি।"

আজ সকলেই নিমন্ত্রিত। একটি লম্বা দালানে আমাদের সকলের জায়গা হইয়াছে। আহারের সময় অসমাপ্ত দাবার বাজির প্রত্যেক চালটির পরিণাম কিস্তীলাভের বিষয় উৎসাহের সহিত আলোচিত হইতেছিল।

আহার সমাপ্ত হইলে ভবানীবাবু নিমন্ত্রিতদিগকে বিদায় করিবার জন্ত বৈঠকখানায় গমন করিলেন। আমাকে বলিলেন, "আপনার আর কষ্ট করিয়া বাহিরে যাওয়ার দরকার নাই।" আমি আহ্লাদের সহিত ভবানীবাবুর বিশ্রামকক্ষে প্রবেশ করিলাম। দূরের একটি প্রকোষ্ঠ হইতে আমার স্ত্রীর কণ্ঠস্বর শ্রুত হইতেছিল।

আমি ঘরে ঢুকিয়া দেখি, ভবানীবাবুর স্ত্রী আমার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, "আপনি এখন আপনার পথ দেখুন, সরোজিনী আজ এখানে থাকিবে।" আমি তাঁহার কথায় বিশেষ মনোযোগ দিলাম না। আমি ভাবিতেছিলাম, বিনোদিনী কেন আসিল না। ভবানীবাবুর স্ত্রী আমাকে চিন্তামগ্ন দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "কথাটা বুঝি পছন্দ হইল না! সরোজিনীকে আমরা ছাড়িয়া না দিলে আপনি কি করিয়া লইয়া যাইবেন?" আমি উত্তর করিলাম, "তা অবশ্য এখন আপনাদের হাত।" একটু পরে বলিলাম, "তবে একটা পান দিতে আজ্ঞা হোক্, প্রণাম করিয়া বিদায় হই।"

"ইষ্, ভারি ভক্তি যে!" এই বলিয়া তিনি বিনোদিনীকে ডাকিলেন। আমিও তাই আশা করিয়াছিলাম।

ভবানীবাবুর স্ত্রী বলিলেন, "আপনাকে সেদিন যে একটি পাত্রের সন্ধান করিতে বলিয়াছিলাম, তাহার কি করিলেন, বলুন।"

"কিরূপ পাত্র চাহেন, তাহা না জানিলে কিরূপে পাত্রের সন্ধান করিতে পারি? বিবাহের বাজারের গতিক ত জানিতেছেন। ভাল ঘরবর ও লেখাপড়া দেখিয়া দিতে গেলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। দেখিতেছেন ত এখন আর কেহ শুধু মেয়ের রূপ দেখিয়া বিবাহ করে না।"

"তাহা হইলে আর ভাবনা কি ছিল? ভাল বংশ হয়, লেখাপড়া জানে, এমন একটি পাত্র যত কমে হয়, দেখিবেন। দোজো বর হইলেও ক্ষতি নাই, যদি বয়েস বেশী না হয়।"

আমি ভবানীবাবুর স্ত্রীর কথায় ক্রমশঃ একরূপ উত্তেজনা অনুভব করিতেছিলাম। অবিলম্বিতফল মনোরথ আমাকে সপ্তমসর্গে উঠাইয়া দিল। আমি কি বলিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে (সৌভাগ্যক্রমে?) আমার বলিবার পূর্ব্বে বিনোদিনী গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার দিদির হস্তে পানের ডিপে দিলেন। তিনি বলিলেন, "তুই যা, দিয়ে আয়।"

আমি খাটের উপরে বসিয়াছিলাম। বিনোদিনী আমাকে পান দিতে আসিলেন। পার্শ্বের কক্ষ হইতে শিশুকণ্ঠের ক্রন্দন-ধ্বনি শুনিয়া "এই রে, খোকা উঠেছে" বলিয়া ব্যস্তভাবে ভবানী-বাবুর স্ত্রী চলিয়া গেলেন। আমি বিনোদিনীর হস্ত হইতে পান লইব কি!—আমার সর্ব্বশিরা দ্রুত স্পন্দিত হইতেছিল। বিনোদিনী আমার পার্শ্বে পান হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। আমার সকরুণ দৃষ্টি তাঁহার মুখের উপর নিবদ্ধ ছিল। দেখিলাম, বিনোদিনী হাসিতেছেন। আমি তাঁহার পানপূর্ণ হস্ত দুই হস্তের মধ্যে লইয়া ঈষৎ চাপিয়া বলিলাম, "বিনো, আমি তোমাকে ভালবাসি, তুমি আমাকে ভালবাস কি?—শীঘ্র বল, এখনই হয়ত তোমার দিদি আবার আসিবেন।"

হায়, তখন বুঝিতে পারি নাই, আমার প্রেমের পরিণাম কি ? বলিতে লজ্জা হয়, আমার দরবিগলিতধারে অশ্রু নির্গত হইতেছিল। বিনোদিনী উত্তর করিলেন না, আমার হস্ত হইতে হাতও ছাড়াইয়া লইলেন না একটি উপাধানের উপর মুখ লুকাইলেন। আমি মনে করিলাম, আমার ভালবাসা ব্যর্থ হয় নাই। আমিও প্রেমের যথার্থ আবেগ সেইদিন প্রথম (এবং সেই শেষ) হৃদয়ে অনুভব করিলাম। কত কথাই বলিতে ইচ্ছা হইল, যাহা বলিবার অবকাশ আর এ জীবনে হয়ত পাইব না। কিন্তু আমার উদ্বেগ-লাঞ্ছিত বাণীর উপর ভরসা হইল না। সেই জন্য মনে করিলাম, দুইএকটি ভাল ভাল প্রেমকবিতার দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করিব। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, মনের ভাণ্ডারটাকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিলাম, কিছুতেই একটি প্রেমকবিতা মনে আসিল না। কামিনী সেন, রবিঠাকুর, নবীন সেন প্রভৃতি কবির নাম মনে হইতে লাগিল বটে, কিন্তু কাহারও একটিও কবিতা মনে পড়িল না। দুইএকটি গান আমার মনে ছিল, অবশেষে তাহাই আবৃত্তি করিতে লাগিলাম। সুর করিয়া গান করিতে পারিলে মিষ্ট শুনাইত, কিন্তু লোকে বলিবে কি ? আমি বলিতে লাগিলাম—

"আমি আকাশে পাতিয়া কান,
শুনেছি শুনেছি তোমারই গান,
আমি তোমারে সঁপেছি প্রাণ, ওগো বিনোদিনী।"

আবেগভরে কহিলাম—

"তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে বাজে যেন সদা বাজে গো,
তোমারি আসন হৃদয়পদ্মে রাজে যেন সদা রাজে গো।"

কাতরকণ্ঠে বলিলাম—

আমি মর্ম্মের কথা, অন্তরব্যথা কিছুই নাহি কব,
শুধু পরাণমন চরণে দিনু বুঝিয়া লহ সব।

আরও বলিলাম—

কি মধুজোছনামাখা, চন্দ্রিমা তুলিতে আঁকা
হেরিলে তব মুখশশী প্রাণ জুড়ায়।

বিনোদিনী আরও মুখ লুকাইতে লাগিলেন। তাঁহার অলকরাজি বিস্রস্ত হইয়া পড়িল। একবার যেন ক্রন্দনের মত স্পষ্টস্বর শুনিতে পাইলাম। জিজ্ঞাসিলাম, "বিনোদিনি, কাঁদিতেছ ?"

বিনোদিনী কোন উত্তর করিলেন না। শুধু আপনার হাত লইয়া মুখ আচ্ছাদন করিলেন। আমার মনেও ভারি দুঃখ হইতেছিল। ইচ্ছা হইল যে, আমার সেই করুণ-রসাত্মক গানটা একবার আবৃত্তি করিয়া ফেলি—"শেষের সে দিন মন, কর রে স্মরণ", কিন্তু ঠিক সময়োপযোগী হইবে না বলিয়া চাপিয়া গেলাম।

ঠিক সেইসময় বিনোদিনীর দিদি আসিলেন। তখনও আমার হস্ত বিনোদিনীর স্কন্ধে ন্যস্ত ছিল। তাঁহার রোষকষায়িত দৃষ্টি কিরূপে সহ্য করিব, তাহা ভাবিয়া তাঁহার দিকে চাহিতে আমার সাহস হইতেছিল না। একটু পরেই ভয়ে ভয়ে চাহিয়া

দেখি, তিনি খুব হাসিতেছেন। তিনি নিকটে আসিবামাত্র বিনো-দিনীও খল্‌খল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিল। আমি চমকিত হইলাম। বিনোদিনী ছুটিয়া পলাইতে যাইতেছিল, কিন্তু ভবানীবাবুর স্ত্রী তাহার নীল বসনাঞ্চল ধরিলেন। বসনখানি তাঁহার হাতে রহিয়া গেল। আর সেই ধুতী ও ওয়েষ্টকোট্‌পরা বালক কক্ষ হইতে হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেল। ভবানীবাবুর স্ত্রী ডাকিলেন "বিনোদবিহারি, এস, তোমার পরিচয় করিয়া দি।" ঘৃণা, লজ্জা ও ক্রোধে আমার সর্ব্বশরীর হইতে যেন আগুনের জ্বালা নির্গত হইতেছিল। ছি ছি আমার স্ত্রী কি মনে করিবেন! আমার কলেবর ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল। তাহার উপর ভবানীবাবুর স্ত্রীর মর্ম্মভেদী উচ্চহাস্য আমাকে নিতান্ত ম্রিয়মাণ করিয়া ফেলিল। আমি কম্পিতহস্তে রুমাল লইয়া মুখ মুছিতে লাগিলাম।

এমনসময় আমার স্ত্রী সে কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার বন্ধু তাঁহাকে দেখিয়া দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত হাসিয়া উঠিলেন। আমার স্ত্রী তাঁহার হাস্যে যোগদান করিলেন না। দরজার নিকট দাঁড়াইয়া অপরাধীর মত কাতরভাবে আমার দিকে একবার চাহিলেন। সে দৃষ্টির মধ্যে অভিমানের মর্ম্মবেদনাও যেন মিশানো ছিল। একটু থাকিয়াই তিনি চলিয়া গেলেন। কিন্তু তাঁহার বিষাদপূর্ণ অভিমানের দৃষ্টি আমার মর্ম্মের অন্তস্তল স্পর্শ করিয়াছিল।

আমি একটি কথাও না বলিয়া সে কক্ষ পরিত্যাগ করিলাম এবং কাহাকেও কিছু না বলিয়া রাজপথের বিজন নিস্তব্ধতা ও অর্দ্ধ অন্ধকারের মধ্যে আমার গ্লানি, লজ্জা ও অভিমান লইয়া ডুবিয়া গেলাম।

উপসংহার।

কতক্ষণ উদ্দেশ্যশূন্যভাবে বেড়াইলাম, তাহার ঠিকানা নাই। অধিকরাত্রে গৃহে ফিরিয়া নিদ্রাদেবীর শরণে অন্তর্দাহ বিস্মৃত হইলাম। পরদিন গৃহিণী আসিলেন। আমি তাঁহার কটাক্ষকে ভয় করিতেছিলাম, কিন্তু তাঁহার সেই পূর্ব্বের মত মৃদু-সুকোমল দৃষ্টি সর্ব্বদা আমার চক্ষুর অনুসরণ করিতেছিল। অদ্যাপি তিনি একটিবারও আমার নিকটে সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন নাই। যেন সে ঘটনাটি আদৌ ঘটে নাই, এমনই ভাবে তিনি ব্যবহার করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্বাভাবিক স্নিগ্ধমধুর ভাব আমাকে অল্পদিনের মধ্যেই সঙ্কোচের ব্যবধান হইতে টানিয়া লইল। এখন আমার চোখে আমার স্ত্রী যেমন সুন্দর, শপথ করিয়া বলিতে পারি, এমন সুন্দর আর কিছুই নাই।

হতভাগ্য।

শনিবার সকাল সকাল আপিসের ছুটি হইলে কাল যখন সকলে আসিয়া ট্রামে চাপিলাম, তখন সপ্তাহের কার্য্য ও কোলাহলময় জীবনের পর একটি সমগ্র দিনের আরাম উদ্দেশে অনুভব করিয়া স্কুলের ছেলেদের ন্যায় আমোদ বোধ হইয়াছিল। কিন্তু কার্য্যই যাহাদের অভ্যস্ত, তাহাদের পক্ষে ছুটির দিন কেবল উদ্দেশেই আরামদায়ক; প্রকৃত পক্ষে ছুটির দিন তাহাদের তেমন ভাল কাটে না। কেমন একটা উদাস অলসতায় শরীরটা যেন অসাড় বলিয়া মনে হয়। তাহার পর, যন্ত্রের মত ১০টায় আপিস করা, ৫টায় বাড়ী ফেরা ও শেষ চুপ চাপ পড়িয়া থাকা একরূপ মন্দ লাগে না। আজ এই চৈত্র মাসের মধ্যাহ্নে—রুদ্ধ গৃহে সময়টা কিছুতেই কাটিতে চাহিতেছে না। তাহাতে এবারে সহরে কিছু অতিরিক্ত গরম পড়িয়াছে, গগন-কেন্দ্রে রবি অনল বর্ষণ করিতেছেন—সূর্য্যদেব যেন সহস্র করে পৃথিবীকে আকর্ষণ করিয়া আপনার জ্বালাময় বক্ষের সন্নিহিত করিতে চাহিতেছেন। বায়ু-তরঙ্গে ইতস্ততঃ বিচলিত বালুরাশি বহু দূর ব্যাপিয়া আবর্ত্তের

সৃষ্টি করিতেছে। উপরে নীলাভ-রজত আকাশ সৌরকরে ঝলসিতেছিল, আর তাহার মধ্য দিয়া কতকগুলি রজতশুভ্র মেঘখণ্ড ইতস্ততঃ ভাসিয়া যাইতেছিল। পথিপার্শ্বের বৃক্ষবিলগ্ন আতপতপ্ত বায়সের বিকৃত স্বরে পথিকের অর্দ্ধ নিমীলিত চক্ষু ক্বচিৎ উন্মীলিত হইতেছিল। মাঝে মাঝে ফিরিওয়ালার অবসাদপূর্ণ চীৎকার ক্ষীণ হইতে স্পষ্টতর হইয়া আবার বহু দূরে ক্ষীণ হইয়া মিলাইতেছিল।

সিমলার একটি কবাট জানালাবদ্ধ নিম্নতল প্রকোষ্ঠে বসিয়া, শুইয়া এবং মস্তিষ্কের উদ্ভাবনী শক্তির" প্রভাবে নানা প্রকার সুখের কল্পনা করিয়া, আরাম করিবার চেষ্টা করিতেছিলাম। হস্তসন্নিহিত হোয়াটনটের ভিতর থেকে দুই একখানা বই টানিয়া লইয়া পড়িবার চেষ্টাও করিলাম কিন্তু কিছুতেই মন সংযত হইল না। অবশেষে একটা স্থূল তাকিয়ায় আমার স্থূলতর দেহভার ন্যস্ত করিয়া আলবোলায় তামাক চড়াইয়া রবারের নলের শব্দবৈচিত্র্যে কথঞ্চিৎ আরাম উপভোগ করিতে লাগিলাম।

কিছুকাল এইরূপে কাটাইয়া যখন নিতান্ত অসহ্য বোধ হইল, তখন সম্মুখের একটা জানালা খুলিয়া দিয়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। আমার ঘরের সম্মুখেই এক ভদ্র লোকের বাড়ী। রোয়াকের নিয়ে এক রাশি ইট রহিয়াছে এবং তাহার উপরে

বসিয়া একটি বৃদ্ধ অনন্যমনে ইট চূর্ণ করিতেছে। হতভাগ্যের এইরূপ দুর্দ্দশা দেখিয়া নিজের অশান্তি যেন অনেকটা কমিয়া গেল। মনে হইল, এই বৃদ্ধ এক মুষ্টি অন্নের জন্য দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে অনাবৃত মস্তকে এত পরিশ্রম করিতেছে, আর সহস্রগুণে শীতল গৃহে, কোমল শয্যায় শুইয়া আমার এত দুঃখ! ঐ বেচারী এবং আমার মধ্যে প্রভেদ কি? আমার পিতার কিছু বিত্ত ছিল, তিনি আমাকে লেখা পড়া শিখাইয়াছিলেন, তাই আমি আফিসের কেরাণী বাবু। আর উহার পিতা হয়ত দরিদ্রতায় প্রপীড়িত ছিল, তাই ও মজুর!

বৃদ্ধ কিছুক্ষণ পরে, বোধ হয় রৌদ্রের তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া, ধীরে ধীরে তাহার হাতুড় লইয়া গাত্রোত্থান করিল। সে কিয়ৎক্ষণের মধ্যে সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারিল না, শেষে অতি কষ্টে গিয়া রোয়াকের উপর দু'খানি হাতে ভর করিয়া বসিয়া পড়িল। দেখিলাম তাহার দুখানি পদই ভগ্ন, কোনরূপে চলিতে পারে মাত্র। সে আমার দিকে ফিরিয়াই বসিয়াছিল। দেখিলাম তাহার ললাট বাহিয়া ঘর্ম্ম বারি পড়িতেছে। আর কষ্টনিঃসৃত শ্বাসে তাহার কঙ্কাল উদ্বেলিত হইতেছে। তাহার কোটরগত এবং সঙ্কুচিত চক্ষু দুটি লক্ষ্যশূন্য বলিয়া বোধ হইতেছিল। তাহার ললাটের শিথিল চর্ম্ম গভীর রেখা-বাহুল্যে পরিণত হইয়াছিল। অতি ক্ষীণ মাংসপেশী ব্যাপিয়া স্ফীত শিরাজাল তাহার

কৃশ দেহে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। বৃদ্ধের ভ্রূকুটি-আনত মুখ মণ্ডল যেন এই মর্ত্ত্য জীবনের নিষ্ঠুর ইতিহাস ব্যক্ত করিতেছিল।

বৃদ্ধের বিশ্রাম করা হইয়া গেল। সে আবার হাতুড়ি লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তখনও তাহার কপালে স্বেদ বিন্দু দূর হইতে লক্ষিত হইতেছিল। অর্দ্ধসেবিত কলিকার দিকে আমার দৃষ্টি পড়িল, কলিকার কুণ্ডলীকৃত ধূমপুঞ্জে পার্শ্বের দেয়াল কম্পিত দেখাইতেছিল। বৃদ্ধ তামাক খাইলে সুস্থ হইবে মনে করিয়া উচ্চৈঃস্বরে তাহাকে ডাকিলাম। সে আমার দিকে মুখ ফিরাইল। তাহার দৃষ্টিতে যেন একটা তীব্র উপেক্ষার ভাব বিদ্যমান ছিল, যেন কাহারও অনুগ্রহ পাইতে সে অভ্যস্ত নহে; পাইবার জন্যও কিছুমাত্র যত্নবান নহে। আমি আবার ডাকিলাম, এবারে সে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আসিয়া আমার বারান্দায় বসিল। তাহাকে আমার কলিকাটী দিলাম। বৃদ্ধ যথেচ্ছ ধূমপান করিয়া কলিকাটী নামাইয়া রাখিয়া জল খাইতে চাহিল। ইহার মধ্যে আমি তাহাকে অনেক প্রশ্ন করিয়া একটিরও উত্তর পাইলাম না। জল পান করিয়া কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলে আমি তাহাকে আবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম, কিন্তু বৃদ্ধ আমার প্রশ্নের উত্তর দিবার আবশ্যকতা বোধ করিল না। সে মাঝে মাঝে অস্পষ্ট ভাষায় কত কি বলিল। তাহার অর্থ সংগ্রহে আমি কৃতকার্য্য হইলাম না। কিন্তু তাহার সেই ভাষা হৃদয়ের অন্তস্তল

হইতে আসিতেছিল। প্রাণের অসম্বদ্ধ চিন্তার স্রোত ভাষার সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে আবদ্ধ থাকে না; দরিদ্র ভাষা তাহার বহু পশ্চাতে পড়িয়া থাকে। আমি তাহাকে বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম 'বুড়ো' তোমার ছেলে মেয়ে কি?' বৃদ্ধ উত্তর না দিয়া, পুনরায় কলিকাটী তুলিয়া লইয়া ধুমপানে প্রবৃত্ত হইল। আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—'তোমার আর কে আছে?' বৃদ্ধ উপরের দিকে হাত তুলিয়া দেখাইল। 'তোমার বাড়ী কোথায়?' 'সঙ্গে সঙ্গে বাবু' তাহার এই সংক্ষিপ্ত উত্তরে যেন কত অনিচ্ছা, কত বিরক্তি মাথান ছিল। কিন্তু আমি ইহাতে যতই তাহার দুঃখের গুরুত্ব বোধ করিতে লাগিলাম, ততই তাহার অতীত ইতিহাস জানিবার জন্য আমার ব্যগ্রতা বাড়িতে লাগিল। বৃদ্ধ বোধ হয় পূর্ব্বে কখনও কোথায়ও সহানুভূতি পায় নাই। সে প্রথমে আমাকে কতকটা বিস্ময় ও কতকটা বিরক্তির চক্ষে দেখিতেছিল। এবং আমার এই অযাচিত যত্নের জন্য কিছুমাত্র কৃতজ্ঞতা দেখান সে আবশ্যক মনে করে নাই। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তাহার মৌনের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। শোকের, দারিদ্র্যের, অত্যাচারের তীব্র নিষ্পেষণে ধৈর্য্যহারা মানবের হৃদয় শেষে অনন্যোপায় হইয়া এক বিন্দু সান্ত্বনার জন্য আকুল হইয়া উঠে। কিন্তু এমনই বিড়ম্বনা যে ঠিক তাহাই সে পায় না। জগতের নিষ্ঠুর ঔদাস্য, ক্রূর উপহাস, মরণোপম উপেক্ষাই তাহার কাল হইয়া উঠে। তখন

সে একমাত্র শরণ শান্তির নিদান মরণকেই সাধনার ধন বলিয়া মনে করে। বৃদ্ধের সমগ্র জীবন যেন ইহারই বিস্তৃত দৃষ্টান্ত স্বরূপ কাটিয়াছে। আজ তাই আমার সামান্য সহানুভূতি পাইয়া হতভাগ্য গলিয়া গেল। তাহার কঙ্কালসার বক্ষের জীর্ণ আবরণ আন্দোলিত করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস বাহির হইল, তাহার অনভ্যস্ত নয়নে স্বচ্ছ অশ্রু দেখা দিল। সে অনেকবার থামিয়া, অনেকবার সামলাইয়া সরল ভাবে তাহার আত্মজীবন-কাহিনী বলিতে লাগিল।

'বাবু, আমার দুঃখের কথা শুনিয়া কি হইবে? ভগবান যাহাকে মারেন তাহাকে কেহ রাখিতে পারে না, তাহা না হইলে এই কাঠ ফাটা রোদে—এই বৃদ্ধ বয়সে—আমি খাটিয়া মরিব কেন? আমার কর্ম্মের ফল আমিই ভোগ করিতেছি। তাহা না হইলে আমার বাড়ী ছিল, ঘর ছিল, একদিন আমার সবই ছিল, বুদ্ধির দোষে সে সব খোয়াইয়া বসিব কেন?—সাবাজ-পুর চেন, বাবু? সাবাজপুরের কাছে আমার বাপের ভিটা ছিল। অতি ছোট কালে আমার বাপ মরিয়া যায়। আমার মা'র হাতে কিছু পয়সা ছিল, তাহাতেই আমাদের চলিয়া যাইত। মা আমার বড় বুদ্ধিমতী ছিল, আর আমাকে যেমন ভাল বাসিত, সকল মা'র তেমন বাসিতে পারে না। বাবার মৃত্যুর পরে তাহাকে নিকা করিবার জন্য অনেকে তোষামোদ

করিয়াছিল, কিন্তু পাছে আমার অযত্ন হয় এই ভয়ে মা কখনও সম্মত হয় নাই। ছেলে বেলায় আমার গায়ে খুব জোর ছিল, আমার বয়সের কেহই আমার কাছে দাঁড়াইতে পারিত না। সে সময়ে অন্নের জন্য ভাবিতে হইত না। কেবল 'গায়ে ফুঁ দিয়া' বেড়াইতাম, আমার তেড়ী ফিরাণ কাল মিচমিচে বাবরি চুল ছিল; রঙ্গীন গামছা কাঁধে লইয়া, আর রিং ঝুলান পাকা বাঁশের লাঠি হাতে করিয়া আমি যখন বেড়াইতাম, তখন সকলে আমার দিকে চাহিয়া থাকিত। এমন দিনও আমার ছিল। যখন শরীরে কষ্ট সহিত, তখন আমি আলস্য করিয়াছি, তাই এই বয়সে ইট ভাঙ্গিয়া খাই, সকলই অদৃষ্টের ফল!

"সাবাজপুরে বছর বছর মেলা হয়, ওখানকার বড়লোক আহম্মদ মিঞারা সেই মেলায় একটী কলসী টানাইয়া ঢেঁড়া পিটিয়া দিত। কুস্তীতে আর লাঠিতে যে জিতিতে পারে, সে সেই কলসী পাইত। ঐ কলসী জিতিয়া আনিবার জন্য সকলে একবার আমাকে ধরিল। মাও তাহাদের কথায় সায় দিলেন। চাদর কোমরে আঁটিয়া লাঠি হাতে করিয়া মেলায় চলিলাম। মা সেই সময়ে কাঠ কাটিতে গিয়া পা কাটিয়া ফেলিলেন, সে দিকে লক্ষ্যও করিলাম না। মেলায় আমার চেহারা দেখিয়া সকলেই বলিতে লাগিল, আমিই ঐ কলসী পাইব। সেখানে দেশ বিদেশের লোকের ভিড় দেখিয়া আমার মনে একটা ত্রাস

হইল। প্রথম প্রথম সকলেরই মনে ভয় হয়। আর ভয় করিয়া চলিতে হয়—দুষ্টলোকদের। তাহারা নানা প্রকার 'গুণজ্ঞান' 'মন্ত্র-তন্ত্র' জানে। না পারিলে শেষে ধূলা পড়িয়া কত লোকের সর্ব্বনাশ করিয়া দেয়। যাক্ হউক, দুই এক 'হাত' কুস্তী লড়িয়া আমার সাহস বাড়িয়া গেল।

কিন্তু শেষ বেলায় কোথা হইতে একটা সাড়ে পাঁচ হাত লম্বা বিকট আকারের লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। লোকজন ত সব হৈ হৈ করিয়া উঠিল। সেও বেশ দুই চারি পাক খেলিয়া আমার নিকটে আসিয়া হাত বাড়াইল। প্রথমতঃ আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল, শেষে আল্লার নাম করিয়া আমিও হাত বাড়াইয়া দিলাম। আমি নীচে পড়িয়া গেলাম, লোকে খুব গোলমাল করিয়া উঠিল। মনে করিল আমি হারিয়াছি। কিন্তু, বাবু, জোর বেশী থাকিলে কি হয়, সে লোকটা কৌশল একেবারেই বুঝিত না। আমি তাহার দুই পায়ের মাঝে মাথা দিয়া এমন ভাবে উপর মুখে ধাক্কা দিলাম যে ঐ বড় জোয়ানটা দশ হাত দূরে ছিট্‌কাইয়া পড়িল। সব লোক চারি-দিক হইতে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। আহম্মদ মিঞা নিজে হাতে করিয়া আমাকে কলসীটি দিলেন, আর তাঁহার বাড়ীতে আমাকে রাত্রে খাইতে বলিয়া গেলেন।"

বৃদ্ধ থামিল, যেন কিছু স্মরণ করিয়া লইবার চেষ্টা করিতে

লাগিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম 'তারপর?' বৃদ্ধ বলিল—

"বাবু সেই ত আমার কাল হইল। আহম্মদ মিঞার সংসারে তাহার এক বিধবা কন্যা ছিল। অমন শ্রী-চেহারার মেয়ে আমাদের দেশে আর ছিল না। সকলেই তাহার সুখ্যাতি করিত। আমি খাইতে বসিয়া দেখিলাম, দরজার আড়াল থেকে সে আমাকে দেখিতেছে। আমি আগে কখনও তাহাকে দেখি নাই; মিঞাদের মেয়েরা কখনও বাড়ীর বাহির হয় না। কিন্তু তাহার ফুটফুটে রঙ ও পটলচেরা চোক দেখিয়া স্থির করিলাম যে এই আহম্মদ মিঞার কন্যা। আমি তাহার দিকে চাহিলে সে দরজা বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল, কিন্তু আবার পরক্ষণেই চাহিয়া দেখি, সে দরজা ঈষৎ খুলিয়া তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। আমার আর বাড়ী ফিরিতে ইচ্ছা হইল না। রাত্রি যখন দ্বিপ্রহর হইয়া গিয়াছে তখনও আমি আহম্মদ মিঞার বাড়ীর পার্শ্বে একটা গাছ তলায় দাঁড়াইয়া ছিলাম, জোছনা ফুট ফুট করিতেছিল। মাঝে মাঝে একটা ঘরের জানালা নিঃশব্দে খুলিয়া আবার তৎক্ষণাৎ বন্ধ হইতেছিল। জানালার পার্শ্বে ছুটুর মুখ দেখিলাম (আহম্মদ মিঞার মেয়ের নাম ছুটু)। জোছনা যখন অস্ত গেল তখন আস্তে আস্তে দরজা খুলিয়া ছুটু বাহির হইয়া আসিল। সে দিন মনে হইয়াছিল যেন সমস্ত জীবন এমনই কাটিবে! সে দিন মরিলেও

বুঝি দুঃখ বোধ হইত না। ইহার পর প্রত্যহ ছুটুর সঙ্গে গোপনে দেখা করিতে আসিতাম। এইরূপে দুই তিন মাস কাটিয়া গেল। একদিন একটা বাগানে বসিয়া আমরা কথা কহিতেছিলাম। রাত্রি অন্ধকার, কোথায়ও আর কেহ ছিল না। হঠাৎ পিছন থেকে আমার মাথায় কে 'বাড়ি' দিল। সে আঘাত পাইয়া আমার বোধ হইল যেন পায়ের তলা হইতে মাটি সরিয়া যাইতেছে; ছুটুর দিকে হাত বাড়াইয়া দিলাম এই মাত্র জানি, তাহার পর আর আমার জ্ঞান ছিল না। সেই সময় যদি আমার মরণ হইত, তবে বাঁচিয়া যাইতাম।

"তিন দিন তিন রাত পরে যখন আমার চৈতন্য হইল, তখন দেখিলাম আমি একটা গোয়াল ঘরে মার কোলে শুইয়া আছি, পাশে ছুটু বসিয়া মাথায় ঔষধ বাঁধিতেছে। ক্ষত একটু আরাম হইলে শুনিলাম যে আহম্মদ মিঞা সেই রাত্রেই আমার ঘর জ্বালাইয়া দিয়াছে। মা পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছিলেন। আর শুনিলাম সেই রাত্রে যখন লাঠির আঘাতে আমি পড়িয়া গেলাম, তখন আমার রক্ত তীরের মত ছুটিয়াছিল। তাহাই দেখিয়া, খুন হইয়াছে মনে করিয়া দুষ্টেরা পলাইয়া গিয়াছিল। শেষে ছুটু আমাকে এক বুড়ীর গোয়াল ঘরে আনিয়া শুশ্রূষা করিতেছে। মা আর ছুটু তিন দিনের মধ্যে কিছু খায় নাই। বুড়ীর বাড়ী গ্রামের শেষ সীমায় ছিল বলিয়া কেহ বড় একটা

সন্দেহ করে নাই। কলঙ্কের আশঙ্কায় আহম্মদ মিঞাও আর কোন অনুসন্ধান করে নাই। বুড়ী ঔষধ কুড়াইয়া আনিয়া দিত ও শেষে আমাদের ভাত খাওয়াইয়া যাইত। সারিয়া উঠিবার আগেই পলাইবার চিন্তা করিতে লাগিলাম, কারণ আহম্মদ মিঞারা বড় লোক, তা'দের সঙ্গে বিবাদ করিয়া ও দেশে থাকা যায় না। তাহারা একটু সন্ধান পাইলেই বোধ হয় আমাদের 'নিকাশ' করিয়া দিত। কাজে কাজেই আমরা তিনটী প্রাণী সংসার-সাগরে ভাসিলাম। ছুটুর গায়ে যে গহনা ছিল তাহাই আমাদের সম্বল, তাহারই উপর নির্ভর করিয়া আমরা রওনা হইলাম। দুই দিন কি তিন দিন পরে আমরা কাশীপুর আসিয়া পৌছিলাম। সেখানে একটা খোলার ঘর ভাড়া লইয়া তিন জনে থাকিলাম। আমার মাথার ঘা আরাম হইলে বোর্ণিও কোম্পানির চটের কলে ঠিকা চাকরী লইলাম। কিছুদিন পরে ছুটুর একটি মেয়ে হইল, মেয়ে যে ঠিক মার মত হয়, তাহা জানিতাম না বাবু, চোক মুখ হাত পা সবই ঠিক যেন মায়ের মত! নিজের কপাল দোষে সব হারাইলাম আর দোষ দিব কা'র? মেয়েটীও যদি থাকিত!"

বৃদ্ধের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, তাহার মর্ম্মের অন্তস্তল হইতে যেন আত্মার অব্যক্ত কাতর ধ্বনি উঠিতে লাগিল। বৃদ্ধ একটু সামলাইয়া লইয়া আবার বলিতে আরম্ভ করিল :—

"আমি যেমন মন্দ অদৃষ্ট লইয়া জন্মিয়াছিলাম, শত্রুরও যেন

এমন না হয়। বাবু, জীবন ত এক রূপ শেষ হইয়া গিয়াছে, এখন দুঃখকে আর ভয় নাই। এত দিন ইচ্ছা করিলে ছার জীবনের অন্ত করিয়া দিতে পারিতাম, কিন্তু আমি যে পাপ করিয়াছি তাহার দণ্ড ভোগ না করিয়া মরিলেও যে শান্তি হইবে না। এখন এই কষ্ট পাইয়াই আমার সুখ, কষ্ট পাইলেই মনে হয় আমার কর্ম্মের প্রতিফল হইল। সেই জন্যই এত কষ্ট পাইয়াও বাঁচিয়া আছি। কিন্তু বাবু, এত দুঃখ পাইয়াও মানুষ বাঁচিয়া থাকে কেমন করিয়া, বলিতে পার? আমি ছেলে বেলায় বড় সৌখীন ও বড় অলস ছিলাম; এক মায়ের এক ছেলে যেমন হয়, আমারও তাহাই হইয়াছিল। কিন্তু যখন ঐ তিনটী প্রাণীকে লইয়া নিজের পরিশ্রমের উপর নির্ভর করিতে হইল, তখন যেন বড়ই জঞ্জাল বলিয়া মনে হইতে লাগিল। বাড়ী হইতে আসিবার পরে নিজে যাহা উপার্জ্জন করিতাম তাহার দ্বারা কিছুতেই চলিত না। ছুটুর গায়ে দুই তিন খানা গহনা ছিল তাহাই বন্ধক দিয়া বা বিক্রয় করিয়া এত দিন কোনও রূপে চলিয়াছে। মেয়েটী হইবার পর হইতে আমার পরিশ্রম শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল। ঠিকা কাজ, পরিশ্রম কম করিলেই উপার্জ্জনও কম হয়। মেয়েটী হইবার কিছুদিন পরে মা রোগশয্যায় পড়িলেন; এমন টাকা কড়ি ছিল না যে তাঁহার চিকিৎসা করাইতে পারি, কিন্তু ইহা সত্ত্বেও আলস্য পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না, কেবল আমার অযত্নেই তিনি ভুগিয়া ভুগিয়া মারা গেলেন।

কিন্তু সহস্র কষ্টের মধ্যেও ছুটু আমার মুখ চাহিয়া কাটাইয়াছে। আমার আলস্যের জন্য সকল দিন তাহার আহার জুটিত না। আমি দেখিয়াও দেখিতাম না। মনে করিতাম, এসব খোঁজ লইতে গেলেই আমাকে বেশী খাটিতে হইবে। খাটুনিও আমার একেবারেই ভাল লাগিত না। এইরূপ একদিন নয়, দুই দিন নয়, তিন বৎসর ধরিয়া অনাহারে জীর্ণ বস্ত্রে অসহ্য ক্লেশে তাহার কাটিয়া গেল। তাহার পর তাহার শরীরে রোগ প্রবেশ করিল। বড় লোকের মেয়ে, কখনও কষ্ট পাওয়া ত অভ্যাস ছিল না। তবু যে সে আমার মুখের দিকে চাহিয়া সব সহ্য করিয়াছিল, তখন তাহা বুঝিতে পারি নাই। তাহার যেমন রোগ বাড়িতে লাগিল, আমারও তেমনি আলস্য বাড়িতে লাগিল। আমি যে কলে কাজ করিতাম, সে কলের সকলেই আমাকে তিরস্কার করিত, আমার তাহা ভাল লাগিত না। অবশেষে সাহেব আমাকে জবাব দিল। আমিও হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম; ছুটু শুনিয়া কত কাকুতি মিনতি করিয়া আবার কাজে যাইতে বলিল, কিছুতেই শুনিলাম না। আমি আবার গেলেই সাহেব আমাকে লইত, কিন্তু সে মতি আমার থাকিলে ত? কিন্তু কাজের হাত এড়াইয়া যে শান্তি পাইলাম, বাড়ীর ঘ্যাণোর ঘ্যাণোর শুনিয়া তাহার চতুর্গুণ বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল। শেষে ছুটু আমাকে এক কথা বলিলে, আমি যাহা মুখে আসিত তাহাই শুনাইয়া দিতাম। সে কখনও কাঁদিত, কখনও রাগ করিত,

কখনও পায়ে ধরিত। তখন আমার চৈতন্য হয় নাই। আমি গরীবের ছেলে, সেই ভালমানুষের মেয়েকে অত সহজে পাইয়াছিলাম, তাই তাহার গৌরব বুঝি নাই! সে আমাকে বাঁদীর ন্যায় সেবা করিত, আর আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে, সে আমারই জন্য সব ত্যাগ করিয়া শেষে আমারই হাতে এত কষ্ট পাইতেছে। এক দিন সকাল বেলায় মেয়েটী ক্ষুধায় কাঁদিতেছিল, তাহার আগের রাত্রে আমাদের অন্ন জুটে নাই। ছুটু মেয়েটীর হাত খানি ধরিয়া আমার সম্মুখে আনিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'একবারটী বাছার মুখের দিকে চাও, এ যে না খাইয়া মরিবে একবার তাহা ভাবিয়াছ কি? সাহেবের হাত পায়ে ধরিয়া বলিলে এখনও তিনি শুনিবেন।' মেয়ে ক্ষুধার জন্য চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছিল, আমার অপমান বোধ হইল। রাগে অন্ধ হইয়া গেলাম, মেয়েটীকে মারিতে লাগিলাম। ছুটু বাঘিনীর মত ছুটিয়া আসিল, তাহাকে ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দিলাম। তাহার গায়ে সেই প্রথম হাত তুলিলাম। দুজনে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। আমি গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলাম।

"সমস্ত দিনমান পথে পথে ঘুরিলাম। সন্ধ্যা হইলে একবার বাড়ী ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু অভিমান আসিয়া উপস্থিত হইল। তবুও কতদূর গেলাম, দেখিলাম আমার গৃহে দীপ জ্বলিতেছে, আবার ফিরিলাম। অনেকক্ষণ রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া

শেষে গঙ্গার চাতালের উপর গিয়া বসিলাম, ছেলে বেলার কত কথা মনে পড়িতে লাগিল। গঙ্গার জলে জোছনা ঝিকমিক করিতেছিল। মনে পড়িল এমনই এক জোছনা রাত্রে আমাদের প্রথম দেখা। আর আজ এই গঙ্গার জলে ডুবিতে পারিলে যেন শরীরটা জুড়াইত। একদিন ত মরিতে বসিয়াছিলাম, সেদিন ছুটু আমার প্রাণ বাঁচাইয়াছিল, আর আমি আজ তাহাদের ভুলিয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। ক্ষুধায় কাতর একটি শিশু মেয়েকে ফেলিয়া আসিয়াছি, এই চিন্তা তখন মনে হইতে লাগিল। মাথা ঝিম ঝিম করিতেছিল। আর ইতস্ততঃ না করিয়া বাড়ীর দিকে ছুটিলাম।

"আমার ঘরে তখনও প্রদীপ জ্বলিতেছিল। মেঝেয় একটা শপের উপর ছুটু মেয়েটাকে বুকের উপর করিয়া শুইয়া আছে—পাছে মেয়েটা জাগিয়া ক্ষুধার জন্য আবার কাঁদিয়া উঠে। কিন্তু ছুটুর মুখের দিকে হঠাৎ চোখ ফিরাইয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার সর্ব্বশরীর যেন হিম হইয়া গেল। তাহার মুখে যেন কালি মাখিয়া দিয়াছিল। গণ্ড বাহিয়া ফেন পড়িয়াছে, চক্ষু চালের দিকে স্থাপিত। আমি দেখিয়াই চমকিয়া উঠিলাম। মেয়েটাকে ছাড়াইয়া লইতে গিয়া দেখি মারও যে দশা, মেয়েরও সেই দশা। জীবনে অত কষ্ট দিয়াছি বলিয়া তাহার আদরের মেয়েকে আমার কাছে রাখিয়া যাইতে বিশ্বাস হয় নাই। তাই

সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল! আমি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলাম। আমার হৃদয় যেন ভাঙ্গিয়া যাইতে চাহিল। কিন্তু চোখে এক বিন্দুও জল আসিল না। কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া শেষে উঠিয়া দরজায় খিল দিয়া আসিলাম। সেই শবের উপর তাহাদের দুজনকে একবার জন্মের মত কোলে লইয়া আমি শুইয়া পড়িলাম। মনে করিলাম যদি তাহাদের সঙ্গে যাইতে পারি, কিন্তু আমার মত পাপীর ইচ্ছা কি পূর্ণ হয়? অত দুঃখের মধ্যেও আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম। যখন চৈতন্য হইল তখন দেখিলাম আমার শিয়রে দুজন পাহারাওয়ালা, আমার হাতে হাতকড়ি, দরজা ভগ্ন; প্রদীপ তখনও জ্বালা রহিয়াছে। বেড়ার মধ্য দিয়া রৌদ্র ঘরে আসিয়াছে।

পুলিশের কাছে আমি বলিলাম যে আমিই ইহাদিগকে বিষ খাওয়াইয়া মারিয়াছি। দায়রায়ও সেই কথা বলিলাম। সত্য সত্যই আমি তাহাদের মৃত্যুর কারণ, আমার শাস্তি হওয়া উচিত। কিন্তু ফাঁসি হইল না; আমার দ্বীপান্তর হইল। দশ বৎসর সেইখানে ছিলাম। তারপর আমাকে কলিকাতায় আনিয়া ছাড়িয়া দিল। কিন্তু জেলই বা কি, আর খালাশই বা কি? আমার সবই সমান। একবার সেই বাড়ীর সন্ধান করিয়াছিলাম। কিন্তু চিনিতে পারিলাম না; অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। যখন জেলে ছিলাম তখন ইট ভাঙ্গাই আমার কাজ ছিল। দুপর রোদে

ইট ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া আমার শরীর চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। আমার উপযুক্ত শাস্তি হইয়াছে কি, বাবু? এখন আর কোন কাজই করিতে পারি না; যেখানে ইট ভাঙ্গার কাজ পাই সেই খানেই যাই—বাবু আমার দুঃখের কথা শুনিয়া কি হইবে? যে পাপ করিয়াছি শত জন্ম এমন করিয়া খাটিলেও তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইবে না।"

বৃদ্ধের কথা শুনিয়া আমি অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলাম না। তাহার এই মর্ম্মস্পর্শী ইতিহাস, এই তীব্র যন্ত্রণা আমার হৃদয়ে অনন্ত তরঙ্গ তুলিয়া দিল। কত কি ভাবিতে লাগিলাম। জানালার দিকে ফিরিয়া চাহিলাম—তখন শ্রান্ত রবির শেষ কিরণ-রেখা উচ্চ সৌধশির হইতে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। আকাশে যেন নীল ঢালিয়া দিয়াছে, আর শুভ্র মেঘের পরিবর্ত্তে লাল ছোট ছোট মেঘ খণ্ড আকাশের নীল পটে নানা মূর্ত্তি গড়িতেছিল।—তখনও ইটের উপর বসিয়া বৃদ্ধ আপন মনে ইট ভাঙ্গিতেছিল।

প্রেমে প্রতিদ্বন্দী।

"দিলুয়া আমাকে ভালবাসে না।"

রমণীয় একটী উপত্যকায়, ক্ষুদ্র অথচ পরিপাটী একখানি গৃহ। তাহার পশ্চাদ্দেশে দ্রাক্ষালতার কুঞ্জ সন্ধ্যাসমাগমের বহু পূর্ব্বে স্নিগ্ধ গোধূলির সৃষ্টি করিয়াছিল। বাতায়নে সুন্দরী নাইনু; বাতায়ন তলে নাইনুর প্রেমাভিলাষী যৌবনদৃপ্ত দিলুয়া ও মুন্না। তাহারা পঞ্চদশ পল্টনের সৈনিক। উভয়ের পৃষ্ঠদেশে বন্দুক, কটিতে ছুরি, পরিধানে খাকি ও মস্তকে উষ্ণীষ। নাইনু সরবৎ প্রস্তুত করিয়া তাহাদের দিতেছিল। দিলুয়াকে এক গেলাশ সরবৎ দিবার সময় সে বলিল,—

"দিলুয়া আমাকে ভালবাসে না।"

তখন তাহার অধর কোণে হাসির আভাস দেখা দিল, ললাটের কুঞ্চিত কেশ দুলিয়া উঠিল এবং আঁখিতে বিদ্যুৎ খেলিল। দিলুয়া বেচারীর মুখখানি সন্ধ্যার মেঘের মত নিবিড় হইয়া উঠিল। সে সরবৎ লইয়া একমনে পান করিতে লাগিল। মুন্না তাহার সরবৎ একটুকু ছলকাইয়া নাইনুর চক্ষে দিল। সরবৎ খাইয়া দিলুয়া বলিল, "নাইনুর হাতের সরবৎ আজ হয় ত শেষ"—

"সত্যি, নাইমু, আজ হয়ত শেষ।" মুন্না এই কথা বলিয়া বাম হস্তে একবার চক্ষু রগড়াইল। নাইমু দীর্ঘশ্বাস ফেলিল।

দিলুয়া বলিল, "আজ সন্ধ্যার পর যখন নাম ডাকা হইবে, তখন আমাদের না পাইলেই পরওয়ানা জারি ও হুলিয়া বাহির হইবে। কত কাল পলাইয়া বাঁচা যাইবে? ধরা পড়িলেই শির মাটীতে লুটাইবে।"

মুন্না। "জীবনের এত মায়া,—ধেৎ।" নাইমু মুন্নার দিকে চাহিল। মুন্না দেখিল, নাইমুর ডাগর ডাগর চোখ দুটিতে স্থির, গভীর দৃষ্টি।

দিলুয়া বলিল, "জীবনের মায়া নহে, মুন্না; তুই কি তাই বুঝ্‌লি? যে জন্য যা' কর্‌লাম, তাই যে মাটি হ'তে চল্‌ল। নাইমুকে যদি না পেলাম, তবে কিসের জন্য এত ক'রলাম? আমরা যে এ যাত্রা পার পাব, সে আশা মিছে।"

মুন্না। "একান্তই যদি জান দিতে হয়, তা আর কি করা যাবে? নাইমু, আমাদের জন্য একটু কাঁদ্‌বে। কাঁদবি না রে, নাইমু?" মুন্না দিলুয়া অপেক্ষা বয়সে ছোট।

নাইমু চোখ মুছিয়া ভাঙ্গা-ভাঙ্গা গলায় বলিল, "তোমরা আমাকে সেই রাক্ষসটার হাত থেকে বাঁচিয়েছ, আমার জাত রাখিয়াছ, ধর্ম্ম রাখিয়াছ; আমার এ ছার প্রাণ দিলে যদি তোমাদের ভাল হয়, এখনই হাসিতে হাসিতে তাহা দিতে পারি।

আমার কিনা বাপ ভাই কেউ নেই, তাই কাপ্তেনটা মনে করেছিল, এ ছুঁড়িটাকে চট করে' হাত করা যাবে। আরে, রাজপুতের মেয়ে কি অত সহজে মেলে? সে আমাকে বিয়ে কর্‌বে বলে' পাঠিয়েছিল; বালাই আর কি? তার গোরটা কোথায় রে মুন্না? আমাকে এক বার দেখিয়ে আন্‌তে পারিস্‌ ত' ভাল ক'রে তা'কে বিয়ে ক'রে আসি।"

মুন্না বলিল, "কাপ্তেন যে দিন যখন এদিকে আস্‌ছিল, তখন তার স্ফূর্ত্তি দেখে কে? ঝাউ বনের মধ্যে তখন একটু একটু অন্ধকার হয়েছে। দিলুয়া আগে ঠাহর করতে পারে নি। সে দিন লোকটার গতিক দেখেই আমি ঠিক্‌ কর্‌লাম যে, সে এই দিকেই আস্‌ছে। তুই যে রোজ সন্ধ্যাবেলায় ঝরণার জল আন্‌তে যাস্‌, কাপ্তেন বোধ হয় সে খবর রাখ্‌ত। তাই অত পোষাকের বাহার, না দিলুয়া?"

নাইনু একটু হাসিল। দিলুয়া মস্তক উন্নত করিয়া বলিল, "পহেলা গুলি আমার।"

মুন্না বলিল "আমি আগে হাঁক দিয়া তার সুমুখে গেলাম। আমার ইচ্ছা যে তাকে বন্দুক উঠাতে সময় দি। ঠিক সেই সময়ে তোমার গুলি দড়াম ক'রে তার বুকে লাগ্‌ল। আর তার পিস্তলটি অমনি হাত থেকে খসে পড়্‌ল। তখন আমি আর এক গুলি ঝেড়ে দিলাম। নেহাৎ কুকুরটার মত না মেরে

ফেলে, তাকে পিস্তল বাগিয়ে নিতে অবকাশ দিলে ভারি মজা হ'ত।"

দিলুয়া বলিল, "আজ তা'হলে মুন্না আর নাইমুর হাতের সরবৎ খেতে আস্‌ত না। ঝাউবনে সব ফরসা হয়ে যেত।"

মুন্না বলিল, "ঈস্‌; যদি নেহাত তাই হ'ত, তাতেই বা ক্ষতি কি ছিল? একদিন আগে আর একদিন পরে বইত নয়!"

"ছি, মুন্না" বলিয়া নাইমু প্রশংসাপূর্ণ নেত্রে দিলুয়ার দিকে চাহিল। বুঝিল সে দিন দিলুয়া না থাকিলে মুন্না মরিত।

অস্তরবির অংশুমালায় পর্ব্বত চূড়া ঝলসিয়া উঠিল। উপত্যকায় আসন্ন সন্ধ্যার ছায়া পড়িল। দিলুয়া পর্ব্বতচূড়ার দিকে চাহিল এবং অঙ্গুলি সঙ্কেতে মুন্নাকে দেখাইল। একজন সৈনিক দূরবীণ্ দিয়া পর্ব্বতচূড়া হইতে চতুর্দ্দিক দেখিতেছিল। মুন্না বলিল, "আর দেরি নয়, নাইমু তবে আসি।" এই বলিয়া নাইমুর হস্ত ধারণ করিয়া ছলছল নেত্রে তাহার দিকে চাহিল।

নাইমু চক্ষু মুছিল। বলিল, "আমি কোথায় থাক্‌ব? তোমরা আমার জন্য পথে পথে বেড়াবে, জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুর্‌বে, আর আমি ঘরে বসে' আরাম করব? আর তা'ও কি ওরা আমায় আরামে থাক্‌তে দেবে? হয়ত ধরে নিয়ে গিয়ে অপমান কর্‌বে। আমিও তোমাদের সঙ্গে যাই, চল।"

দিলুয়ার মুখ কালবৈশাখী মেঘের মত গম্ভীর ও অন্ধকার হইয়া আসিল। সে মুন্নাকে ডাকিল "চলে আয়, মুন্না।"

মুন্না বলিল "সত্যি নাইনু, আমাদের সঙ্গে যাবি? তোর লোকেরা কিছু বল্‌বে না ত?"

দিলুয়া কঠোর স্বরে আবার ডাকিল "চলে আয়, মুন্না। নাইনু কোথা যাবে? নিজেদের মাথা রাখ্‌বার যেখানে এতটুকু যায়গা নেই, সেখানে নাইনুকে নিয়ে কোথায় রাখ্‌ব? তুই চলে আয়।"

"নাইনুর মাথা রাখ্‌বার যায়গা হবে না, বটে!" এই বলিয়া নাইনু জানালা হইতে অদৃশ্য হইল। এমন সময় দূর হইতে বিউগিলের কর্কশ নিনাদ শ্রুত হইল! বজ্রমুষ্টিতে দিলুয়া মুন্নাকে টানিয়া লইয়া গেল—যেখানে বাব্‌লা গাছের শাখায় তাহাদের ঘোড়া বাঁধা ছিল। মুন্না সতৃষ্ণ নয়নে বাতায়নের দিকে চাহিল। নাইনু সেখানে ছিল না। মুহূর্ত্তমধ্যে অশ্বক্ষুরধ্বনিতে উপত্যকা প্রতিধ্বনিত হইল। কিছুক্ষণ পরে আর একটি অশ্ব তাহাদের অনুবর্ত্তী হইল। ততক্ষণে পূর্ব্বোক্ত অশ্বদ্বয় দৃষ্টিসীমার বাহিরে গিয়াছিল। শেষোক্ত অশ্বে ছিল—নাইনু।

পাহাড়ের পর পাহাড়ের সারি যেখানে দৃষ্টিরেখাকে চতুর্দ্দিকে

পরিচ্ছিন্ন করিয়াছে, নিঝ'রিণীর অবিরল ধারা যেখানে পর্ব্বতগাত্র নিষিক্ত করিয়া নিম্নে হ্রদের সৃষ্টি করিয়াছে, যেখানে ঝাউ বাবলার নিভৃত কুঞ্জে পক্ষিকুল মধ্যাহ্নের খররবির কর হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য আশ্রয় লইতেছে, সেইখান দিয়া দিলুয়া ও মুন্না মন্দগতিতে তাহাদের অশ্ব চালাইতেছিল। তাহারা সৈনিকের বেশ পরিত্যাগ করিয়াছিল; তবে অঙ্গরাখার নিম্নে ছুরি ও পৃষ্ঠে বন্দুক ঝুলাইতে ভুলে নাই।

সমসুখদুঃখভোগী, অনির্দ্দেশ্য পথের পথিক, একই রমণীর প্রেমাকাঙ্ক্ষী দুইজন যুবক আসন্ন মৃত্যুর ছায়ায় কি রহস্যময় বন্ধনে পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা তাহারাই জানে। উভয়েই জানিত যে তাহারা বিপদের অনলকুণ্ডে এক সঙ্গে ঝাঁপ দিয়াছে। উভয়েই জানিত—অদৃষ্ট তাহার কুহেলিকাময় আবরণের অন্তরালে যে ফল সঞ্চিত রাখিয়াছে, তাহা উভয়কে তুল্যরূপে ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু সে জন্য তাহাদের মনে অশান্তি ছিল না। নাইমুর আশা আর তাহাদের নাই, চির-জন্মের মত তাহারা সেখানে বিদায় লইয়াছে। এখন তাহারা পর্ব্বতগহ্বরে, অরণ্যে, কান্তারে গান গাহিয়া, গল্প করিয়া, যদৃচ্ছালব্ধ আহারে পরিতৃপ্ত হইয়া সময় কাটায়। নাইমুর কথা উঠিলে মুন্নার চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিত, দিলুয়া ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করিয়া অন্য দিকে চাহিয়া থাকিত। মুন্না দিলুয়া অপেক্ষা বয়সে

ছোট। বয়ঃকনিষ্ঠের প্রতি জ্যেষ্ঠের যাহা কর্ত্তব্য, দিলুয়া সুযোগ পাইলে সে কর্ত্তব্য করিতে ভুলিত না। দিলুয়া জানিত, মুন্না সংসারের কিছুই জানে না, সে বালক। তাহাকে চালাইয়া লইবার, তাহাকে আগ্‌লাইয়া রাখিবার ভার যেন কে তাহার বলিষ্ঠ সহিষ্ণু স্কন্ধে ন্যস্ত করিয়াছে, এমনই ভাবে সে চলিত। মুন্না পদে পদে অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিত, বিপদের সন্নিহিত হইত, দিলুয়া তাহাকে সাম্‌লাইয়া লইত। এমনই ভাবে সপ্তাহ কাটিয়া গেল।

একদিন অনেক পথ চলিয়া তাহারা শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। অপরাহ্নের স্নিগ্ধ বায়ু তাহাদের স্বেদসিক্ত কঠিন চর্ম্ম জুড়াইয়া দিতেছিল। সে দিন কিছু ফল ও ঝরণার জল ছাড়া আর কিছু তাহাদের জোটে নাই। উভয়ে বল্‌গা ছাড়িয়া দিয়া অশ্বের যদৃচ্ছাগতির উপর নির্ভর করিয়াছিল। ক্রমে তাহারা নিম্নে অবতরণ করিতেছিল। দুইটি অনুচ্চ পাহাড়ের মধ্য দিয়া সুপ্রশস্ত লোহিতকঙ্করময় রাজপথ চলিয়া গিয়াছে। রাস্তার দুধারে তমাল, বকুল, শিশু ও সুপারি বৃক্ষের শ্রেণী রাজপথকে অতি স্নিগ্ধ ও রমণীয় করিয়া রাখিয়াছিল। অশ্বারোহীদ্বয় পক্ষিকুলের কলরবে মোহিত হইল।

একটি স্তম্ভগাত্রে একখানি লিপি সহসা তাহাদের দৃষ্টি

আকর্ষণ করিল। উভয়ে তাহার নিকটে গিয়া দেখিতে পাইল, বড় বড় ছাপার অক্ষরে একখানি ঘোষণাপত্র সেই স্তম্ভগাত্রে বিলম্বিত রহিয়াছে।

পঞ্চদশ পল্টনের কাপ্তেনের হত্যাকারী দিলুয়া ও মুন্না নামে দুই জন পলাতক সৈনিককে জীবিত বা মৃত ধরিয়া দিতে পারিলে দশ হাজার টাকা পুরস্কার প্রদত্ত হইবে—এই ঘোষণা বাহির হইয়াছে। আসামীদ্বয়ের মধ্যে একজন অপরকে ধৃত করিয়া দিলে ক্ষমা এবং যথেষ্ট পুরস্কার পাইবে, এ কথাও তাহাতে লেখা ছিল। ঘোষণা পাঠ করিয়া দিলুয়া গম্ভীর হইল। মুন্না হাসিয়া উঠিল এবং অশ্বের উপর এক লম্ফে দণ্ডায়মান হইয়া ঘোষণাপত্রখানি ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। এইবার দৃঢ়মুষ্টিতে অশ্বের বল্গা ধরিয়া তাহারা আবার অন্য পাহাড়ে উঠিতে আরম্ভ করিল।

অনেকক্ষণ তাহাদের মধ্যে কোনো কথাবার্ত্তা হইল না। মুন্না অগ্রে দিলুয়া পশ্চাতে। দিলুয়ার অশ্বক্ষুর উপলে বাজিয়া হঠাৎ শব্দ হইলে মুন্না চমকিয়া উঠিল, এবং অশ্বের মুখ একেবারে ঘুরাইয়া দিলুয়ার সম্মুখীন হইল। উভয়ে অপ্রতিভ হইল। এইবার দিলুয়া আগে আগে চলিতে লাগিল। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। পথভ্রান্ত বিলম্বিতগমন হংসের শ্রেণী সশব্দে তাহাদের মাথার উপর দিয়া উড়িয়া গেল। উভয়ে চমকিয়া উঠিয়া কটিতে ছুরিকায় হস্তার্পণ করিল। দিলুয়া পশ্চাতে সচকিতে চাহিল।

তাহাদের মনে যেন কোথাও এতটুকু সন্দেহ কণ্টকের মত থাকিয়া থাকিয়া বিঁধিতে লাগিল। আবার নিঃশব্দে উভয়ে পথ চলিতে লাগিল। ক্রমেই সে নিস্তব্ধতা অসহ্য হইল। মুন্না বলিল, "আজ জ্যোৎস্না উঠ্‌তে দেরি আছে।" দিলুয়া সে স্বরেও চমকিত হইল।

জড়িতকণ্ঠে দিলুয়া উত্তর করিল "তোর কি ভয় কর্‌ছে?"

মুন্না "শ্‌ শ্‌" বলিয়া তাহাকে চুপ করিতে ইঙ্গিত করিল। উভয়ে কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিল। সন্ধ্যার সে প্রগাঢ় নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া মৃদু অথচ গভীর শব্দ বনান্তরাল হইতে আসিতেছিল। দিলুয়া বলিল "কিছু নাঃ।" কিছুক্ষণ আর সে শব্দ শ্রুত হইল না। আবার "বুম্‌" "বুম্‌" শব্দ হইল। আর অপেক্ষা না করিয়াই অশ্বারোহীদ্বয় প্রচণ্ডবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া দিল। যখন তাহাদের বেগ শিথিল হইল তখন অশ্বদ্বয়ের মুখে ফেণপুঞ্জ দেখা দিয়াছে এবং আরোহিদ্বয়ের বসন ঘর্ম্মে সিক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

দিলুয়া বলিল, "আরে ওটা একটা পেঁচা।" মুন্না বলিল "তাইত, সেটা মনেই আসে নি।" বাস্তবিক এরূপ পেচকের ডাক তাহারা অনেকবার শুনিয়াছে—কিন্তু আজ এ কি কাণ্ড! উভয়ে উচ্চহাস্য করিয়া সে ঘটনা ভুলিতে চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু তাহারা মনে মনে বড়ই লজ্জিত হইয়া পড়িল।

লজ্জার আরও কারণ এই যে, এমন একটা অব্যক্ত, অস্ফুট সংশয় অল্পে অল্পে তাহাদের মাঝখানে এক দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরের সৃষ্টি করিয়া দিতেছিল, যে কেহ কাহারও নিকট তাহা ব্যক্ত করিতে পারিতেছিল না। তাহাদের নিজের মনেও সে সংশয়টা ভাল করিয়া—মূর্ত্তি লইয়া তখনও দেখা দেয় নাই। হঠাৎ দিনের আলোকরাশির মাঝখানে পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণের অন্ধকার যেমন ধীরে ধীরে পৃথিবী ছাইয়া ফেলে এবং সমস্ত প্রাণিকুলকে ভয়ে আচ্ছন্ন ও স্পন্দহীন করিয়া দেয়, তেমনি এই সন্দেহের অন্ধকার তাহাদের সুস্থ সজীব হৃদয়ের উপর ধীরে ধীরে একটা বিশাল অনর্থের ছায়াপাত করিয়া তাহাদিগকে ভিতরে ভিতরে ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছিল। কখন্ ঠিক কোনখান হইতে মনের মধ্যে এই যে প্রচ্ছন্ন একটা অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল, তাহা তাহারা ভাল করিয়া বিচার করিবার অবকাশই পায় নাই। এই বিজন, সঙ্গিহীন অরণ্যমধ্যে, হয়ত বা মরণযাত্রার পথে তাহাদের প্রকৃতি এমন একটা সুস্থ, শান্ত, উদার বন্ধুত্বের টানে পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হইতেছিল যে, এই অজ্ঞাতপূর্ব্ব সন্দেহের প্রথম আবির্ভাবে তাহারা অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। সেই ঘোষণাপত্র!—পলাতক আসামীদ্বয়ের মধ্যে যে কেহ অপরকে ধরাইয়া দিয়া ক্ষমা, পারিতোষিক, গৃহ, স্বজন, স্বাধীনতা ও সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান নাইমুর অবিভক্ত প্রেম—এ সবই

পাইতে পারে। একি অজ্ঞাত আকাঙ্ক্ষা! একি দৈব ব্যাধি! তাহাদের সৈনিকের সরল বলিষ্ঠ হৃদয় এমন মলিন, জঘন্য, কুৎসিত স্পর্শ আর কখনও অনুভব করে নাই। সেই পরিষ্কার ছাপার অক্ষরগুলি যেন দশগুণ বড় হইয়া চোখের সম্মুখে নাচিতে লাগিল। বায়ুর কূজন হইতে তারকার মৃদুস্পন্দন পর্য্যন্ত যেন সেই অক্ষরগুলি ফিরিয়া ঘুরিয়া তাহাদের কাছে ফুটিয়া উঠিতেছিল।

নির্ম্মল প্রভাতে কুয়াশার মত, জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে দুঃস্বপ্নের মত, আগতপ্রায় অবশ্যম্ভাবী গুরুতর অমঙ্গলের ছায়ার মত, এই সন্দেহ সৈনিকদ্বয়ের হৃদয়কে সবলে পীড়িত ও বিধ্বস্ত করিতে লাগিল। সেইদিন তাহারা প্রথম জানিল যে প্রেমের পথ কুসুমাস্তৃত নয়—সেই দিন তাহারা বুঝিল যে তাহারা প্রেমে প্রতিদ্বন্দ্বী।

যতদিন তাহারা নাইমুর সদ্যোদ্ভিন্ন যৌবনের অমল কিরণে মুগ্ধ ছিল, ততদিন আপনাদের হৃদয় যাচাই করিয়া দেখিবার তাহাদের অবসর হয় নাই। তাহাদের চিন্তাশূন্য অবাধ সৈনিক-প্রকৃতি এ সকল তুচ্ছ বিচার বিতর্কের বহু উর্দ্ধে তাহাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। নাইমু তুল্যহস্তে তাহার দুর্লভ প্রেম দুইজনকে বণ্টন করিয়া দিত। তাহাতেই তাহারা সুখী ছিল—কখনো যে উভয়ের মধ্যে স্বত্ব স্বামিত্ব বা অধিকার লইয়া বিতর্ক উঠিতে পারে, এ কথা তাহাদের মনে বড় স্থান পায় নাই। কারণ

তাহারা বেশ জানিত যে নাইমুর পক্ষপাতিত্বই শেষে জয়পরাজয় সহজে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবে। ঘটনাপরম্পরা তাহাদিগকে অন্য দিকে টানিয়া আনিয়াছে; এখন, সেই ঘোষণাপত্রের সঙ্গে সঙ্গে বুঝি নাইমুর কোমল মুখ খানি, তাহার লজ্জাচকিত মুগ্ধ নয়ন দুটি তাহাদের মানস-সরসীতে ভাসিয়া উঠিতেছিল! কেমন করিয়া তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিবে? অতীত প্রেমের স্মৃতিকে ছাড়িয়া যতই জোরে তাহারা তাহাদের যত্নবর্দ্ধিত বন্ধুত্বকে চাপিয়া ধরিতে চাহে, ততই সে বন্ধুত্বের মাঝে একটা প্রকাণ্ড শূন্যতা আসিয়া দেখা দেয়। এমনই করিয়া আজ অকস্মাৎ বন্ধুত্বের বন্ধন বাধা পাইতে লাগিল।

সৈনিকদ্বয় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, পর্ব্বতগাত্রে শষ্পগুল্মবিহীন একখণ্ড ভূমি পাইয়া তাহারা আর উপরে উঠিতে বিরত হইল। দ্রুতবেগে এই 'চড়াই' এ আসিতে অশ্বও শ্রান্ত হইয়াছিল। একটি বৃক্ষের স্কন্ধে তাহাদিগকে বাঁধিয়া রাখিয়া সৈনিকদ্বয় সেই অনাবৃত ভূমিতে শয়ন করিয়া বিশ্রাম লাভ করিল।

অধিকরাত্রে যখন জ্যোৎস্না উঠিল, এবং চন্দ্রকিরণের তরল স্পর্শে চতুর্দ্দিকের বনভূমি যখন সাড়া দিয়া উঠিল, তখন সে নিস্তব্ধতা সৈনিকদ্বয়ের পক্ষে অসহ্য বোধ হইল। তাহারা কেহই এপর্য্যন্ত ঘুমায় নাই। নিশার কষ্টলব্ধ বিশ্রামকে তাহারা এত নিকটে পাইয়াও হারাইয়াছে। অন্যদিন হইলে, তাহারা

গল্প করিয়া, হাসিয়া, গান গাহিয়া অবশিষ্ট রজনী প্রভাত করিয়া দিতে পারিত, কিন্তু আজ যে তাহারা পরস্পরের নিকট অপরাধী! আপনার অস্তিত্ব পাষাণগাত্রে মিলাইয়া দিয়া কোন প্রকারে আজ আত্মগোপন করিবার চেষ্টাই তাহাদের মধ্যে বলবতী। শয়নের পর, অপরকে জাগাইবার ভয়ে কেহ পার্শ্বপরিবর্ত্তন পর্য্যন্ত করে নাই। কিন্তু এমন করিয়া অবরুদ্ধ দুর্গতোরণে পাহারা দিবার মত কঠোরতা তাহাদিগের হৃদয়কে ক্রমেই বিদ্রোহী করিয়া তুলিতেছিল। মুন্না উঠিয়া বসিল।

দিলুয়া তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করিল, “কি ও?”

“কিছুই না।”

“ঘুমাস নি?”

“আজ বড় গরম। তোমারও বুঝি ঘুম হয়নি!”

দিলুয়া কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইল না।

কিছুক্ষণ উভয়ে চুপ করিয়া রহিল। তার পর, মুন্না হাসিল; দিলুয়া চঞ্চল হইয়া উঠিল। মুন্না বলিল,

“আমি যদি বল্‌তে পারি, তুমি কি ভাব্‌ছিলে!”

দিলুয়া বলিল—“কি বল্ দেখি?”

“বাজি।”

“বাজি!”

“সেই ঘোষণা!”

"ঠিক বলেছিস্"। দিলুয়ার স্বর হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গেল! তাইত মুন্না ত ঠিক কথা বলিয়াছে; এ কি রকম হইল! মুন্না তখনও হাসিতেছিল; দিলুয়া কিন্তু সে হাসিতে যোগদান করিতে পারিল না।

মুন্না ঘোষণাপত্রের ভাষা অনুকরণ করিয়া বলিল—"আসামী দ্বয়ের মধ্যে যে কেহ অপরকে—"

"সাবধান, মুন্না! সব জিনিস নিয়ে ঠাট্টা ভাল নয়।"

"সাবধান, দিলুয়া। সত্য গোপন করো না,—আমাকে ধরিয়ে দিবার কথা তুমি এতক্ষণ ধরে' ভাব্‌ছিলে!"

"মিথ্যা কথা! তার আগে এই বন্দুকের এক গুলিতে সব ফরসা হবে।"

এইবার মুন্না গম্ভীর হইল। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সে বলিল "আচ্ছা, সেই বিকাল থেকে মাথার মধ্যে এমন একটা তোলাপাড়া আরম্ভ হয়েছে কেন বল দেখি? বেশ থাকা যাচ্ছিল, হঠাৎ সেই ঘোষণাটা—"

মুন্না তাহার বাক্য শেষ করিতে পারিল না। কথাগুলি বলিতে তাহার কণ্ঠতালু শুষ্ক হইয়া উঠিতেছিল।

দিলুয়া বলিল "হাঁ, সেই হ'তে যেন আর ভাল লাগ্‌ছে না।"

"নাঃ—আর ভাল লাগ্‌ছে না।"

আবার কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল।

"নাইমুর কথা ভাব্‌ছিস্?"

"তুই বুঝি তাই ভাব্‌ছিলি?"

"হাঁ মুন্না। আজ নাইমু আমাদের মাঝ খানে হঠাৎ এসে পড়েছে। তা নইলে দিন গুলো বেশ কেটে যাচ্ছিল। ঘোষণাতে আমাদের বন্ধুত্ব এমন চট্‌করে ভেঙ্গে দিতে পারত না, যদি না তার পেছনে নাইমুর ছবিপারা মুখ খানা থাকৃত।"

"ঠিক বলেছিস্; আমি সেই কথাই ভাব্‌ছিলাম। যতই নাইমুর কথা ঠেলে ফেলতে যাচ্ছি, ততই আরও যেন জোর করে সে মনটাকে টেনে নিচ্ছে।"

"এখন উপায়? বিশ্বাস হারিয়ে এক সঙ্গে থাকা চলে না, মুন্না। আমাদের সে বিশ্বাসে ঘা দিয়েছে কে? নাইমু। হাঁ কি না—বল্‌ দেখি।"

"ঠিক কথা দিলুয়া। নাইমুই মাঝে এসে আমাদের প্রণয় ভেঙ্গে দিচ্ছে।"

দিলুয়া গম্ভীরস্বরে বলিল, "তবে, এক কাজ কর্। তুই আমাকে ধরিয়ে দে। খবরদার 'না' বলিস্ না। তুই ফিরে গেলে নাইমুর আর বিপদের ভয় থাকৃবে না। আমরা যে তাকে বিপদের মাঝখানে ফেলে এসেছি, তা ভাবিস নি? আমি বলছি, তুই স্বচ্ছন্দে ফিরে যা। এই আমার অস্ত্র তোকে সমর্পণ করছি।"

এই বলিয়া দিলুয়া তাহার কটি হইতে ছুরি, পৃষ্ঠ হইতে টোটার

মালা, আর বন্দুকটি তুলিয়া লইয়া মুন্নার কাছে রাখিয়া দিল। অদূরে বৃক্ষ হইতে একটি 'মহক্কা' পাখী মাঝে মাঝে ডাকিয়া তাহার প্রণয়িণীকে প্রবুদ্ধ করিতেছিল। মুন্না কিছুক্ষণ নির্ব্বাক রহিল। তার পর দিলুয়ার হস্ত ধরিয়া বলিল "তুই-ই নাইমুর যোগ্য দিলুয়া। আমি তোর কাছে কিছুই না। তুই ফিরে যা, তোদের জন্য আমি সুখে মর্‌তে পার্‌ব।"

দিলুয়া শুষ্ক কণ্ঠে বলিল "তুই নাইমুর যোগ্য বেশী, কেননা— নাইমু তোকে ভাল বাসে।"

মুন্নার হৃদয়ের এমন একটি তন্ত্রীতে আঘাত পড়িল যে, সে এইবার অধীর হইয়া পড়িল। তার মনে হইল—সেই দ্রাক্ষাকুঞ্জ, সেই সুস্বাদু সরবৎ, আর এক খানি কোমল মুখের করুণ কাতর দৃষ্টি। নাইমু যেন তাহাকেই চাহিতেছে! মুন্নার শিরায় বিদ্যুৎ ছুটিল, সে একেবারে লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল ও কঠোর কণ্ঠে ডাকিল, "আয় তবে যোগ্যতার পরীক্ষা হউক।" ভূমি হইতে দিলুয়ার বন্দুকটি তুলিয়া সে সজোরে দিলুয়ার হস্তে নিক্ষেপ করিল।

দিলুয়া উত্তর করিল; "পাগল! আমি যদি না জান্‌তাম যে আমার লক্ষ্য অব্যর্থ, তা হ'লে তোর প্রস্তাবে সম্মত হ'তে পার্‌তাম।"

"বটে! আজ একবার সে দর্প চূর্ণ হোক্—না দিলুয়া, বেঁচে

থেকে আর সুখ নেই, যদি শান্তিতে মর্‌তে চাস্‌, তবে বন্দুক তোল্‌। মনটা নইলে ক্রমেই বিগ্‌ড়ে যাচ্ছে।”

দিলুয়া বন্দুকের দিকে একবার চাহিল। পরক্ষণেই দেখিল, মুন্না জানুর উপর ভর দিয়া প্রস্তুত হইয়া বসিয়াছে। দেখিয়া তাহারও রক্ত গরম হইয়া উঠিল। ‘মহক্কা’ তখন একটু খানি চুপ করিয়া ছিল। মুন্না বলিল—“পাখীর পহেলা ডাক।”

“তাই হোক” বলিয়া দিলুয়াও প্রস্তুত হইল। পরক্ষণেই পাখী ডাকিল এবং যুগপৎ দুইটি বন্দুকের আওয়াজ—আর সেই সঙ্গে সঙ্গে দুইটি প্রাণহীন দেহ ভূতলে লুণ্ঠিত হইল। মরণের শান্তি তাহাদের সংশয়ক্লিষ্ট মুখমণ্ডলে আবার প্রসন্ন ভাব মুদ্রিত করিয়া দিল!

* * * *

প্রভাতের আকাশ আসন্ন ঝড়ের কালিমায় নিস্তব্ধ ও নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে। বৃক্ষশির ধূসর হইয়াছে, পক্ষিকুল-কাকলি বিরত হইয়াছে, আর পার্ব্বত্য প্রদেশের সেই একান্ত বিজনতা ভঙ্গ করিয়া অশ্বের হ্রেষারব শুনা যাইতেছে। এমনই দুঃসময়ে শ্রান্ত, শীর্ণ, বিষণ্ন এক রমণী সেই দূরাগত হ্রেষাধ্বনি শুনিয়া সেই দিকে আপনার অশ্ব ছুটাইয়া দিল। সেখানে গিয়া সে যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার মুখমণ্ডল একেবারে পাণ্ডুর হইয়া গেল। নাইমু অশ্বপৃষ্ঠ হইতে নামিয়া যখন প্রিয়তমের সাক্ষাৎলাভ করিল, তখন চারিদিকে

বৃক্ষসকল ঝড়ে ভূমিতে লুয়াইয়া পড়িতেছিল। অনাহারক্লিষ্ট বন্ধনগ্রস্ত অশ্বদ্বয়কে মুক্ত করিয়া দিয়া নাইমু যখন পুনরার অশ্বারোহণ করিল তখন একসঙ্গে তিনটি অশ্ব বিদ্যুৎবেগে ঝড়ের গতিকে উপেক্ষা করিয়া পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতান্তরে ছুটিয়া চলিল। উন্মত্তপ্রায় নাইমুর বিস্রস্ত কেশপাশ বাতাসে উড়িতেছিল, বসনাঞ্চল পতাকার ন্যায় পশ্চাতে ভাসিতেছিল; আর তাহার চিত্ত সেই অশান্ত অশ্বেরই মত ছুটিয়াছিল।

সেই পর্ব্বতের উপত্যকাবাসিগণ 'ঝড়ের দেবতা'র নামে এখনও শিহরিয়া উঠে।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।

হেমন্তের গোধূলি কনককিরণে পশ্চিম গগন প্রসাধিত করিয়াছে। নির্ম্মল নীল গগনপট এক বিচিত্র কোমল দ্রবীভূত সুবর্ণের আভায় স্নিগ্ধ ও প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। দূরে উন্নতশির তাল ও নারিকেল বৃক্ষরাজি যেথায় দৃষ্টিরেখাকে পরিচ্ছিন্ন করিয়াছে, সেথায় আলোক ও অন্ধকারের অপূর্ব্ব সমাবেশে অতি মনোহর দেখাইতেছে! মাঝে মাঝে দলভ্রষ্ট বলাকায় গ্রীবা সঞ্চালন পূর্ব্বক সঙ্গীর অন্বেষণ করিতে করিতে সেই শ্যামায়মান পাদপরাজি লক্ষ্য করিয়া চলিতেছে, আর তাহাদের পক্ষপুটের শব্দ সেই হৈমদ্যুতিসম্পন্ন স্নিগ্ধ হেমন্ত গোধূলির নিস্তব্ধ-স্বপ্ন কথনও কথনও ভাঙ্গিয়া দিতেছে।

নিম্নে অনতিবৃহৎ পুষ্করিণীর স্বচ্ছ দেহ একখানি অযত্নরক্ষিত আরসীর মত পড়িয়া আছে। "বারুণীর" মত ঘাসের ফ্রেমে আঁটা না হইলেও, পুষ্করিণীটির সৌন্দর্য্য শ্রীপুরের সর্ব্বজনবিদিত। ইহার একধারে কামিনী, বকুল, টগর প্রভৃতির কুঞ্জ নবনির্ম্মিত সোপানরাজি পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে; অপর দিকে তৃণশষ্প-সমাচ্ছাদিত উদার প্রান্তর যেন ব্যাকুলভাবে দূরে তাল নারিকেল

প্রভৃতি তরুশ্রেণীকে আলিঙ্গন করিতে চলিয়াছে। তীরে কোথায়ও বেতসকুঞ্জে ঝিল্লীর নহবৎ বসিয়া গিয়াছে।

এই নিস্তব্ধ বিজন শান্তি রমাপ্রসাদ উপভোগ করিতেছিলেন; মুগ্ধনেত্রে একবার উন্মুক্ত গগনের দিকে, একবার প্রান্তরের দিকে চাহিয়া পরিতৃপ্তি অনুভব করিতেছিলেন। সোপানাবলীর অনতিদূরে ঘাসের উপর অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় অনেকক্ষণ অবস্থান করিয়া ললিতকলাকুশল রমাপ্রসাদ প্রকৃতির সহিত প্রাণপণে একটি নিগূঢ় বন্ধন অনুভব করিতেছিলেন। উন্মুক্ত গগনতলে, কুসুম-সুরভিত পবনে, পুষ্করিণীর মৃদুহিল্লোলে তাঁহার শিরায় শিরায় এক অনির্ব্বচনীয় প্রফুল্লতা বহাইতেছিল। সমাগতপ্রায় সন্ধ্যার ছায়া যেন তাঁহার অঙ্গে শান্তির স্পর্শ সঞ্চার করিয়া দিতেছিল। প্রকৃতির অব্যক্ত ভাষা তাঁহার হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব করুণকোমল মূর্চ্ছনা তুলিতেছিল। সমস্ত সান্ধ্য-হেমন্তশ্রী যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার সম্মুখে দর্শন দিয়াছে, আর তিনি তাহারই পদতলে বসিয়া অনিমেষ নয়নে সেই সৌন্দর্য্যসুধা পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেছেন। নয়নে তাহারই হৈম-জ্যোতিঃ, হৃদয়ে তাহারই শান্তি, কর্ণে তাহারই মধুর তান। রমাপ্রসাদ নিসর্গ-শোভার আরাধনায় আত্মহারা, প্রকৃতির প্রেমে পাগল। কলাবিৎ রমাপ্রসাদের প্রাণ আজ এক সৌন্দর্য্য প্রতিমার উপাসনায় মৌন, নিস্তব্ধ, অনাবিল ভাবে আপনাকে একেবারে ঢালিয়া দিয়াছিল।

সহসা সোপানাবলীর দিকে চাহিয়া রমাপ্রসাদের চিন্তার সূত্র দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেল। মৃদু ভূষণশিঞ্জিতে তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হইয়াছিল। তিনি যে হেমন্তশ্রী কল্পনার নেত্রে নিরীক্ষণ করিয়া পুলকে কণ্টকিত হইয়া উঠিতেছিলেন, তাহাই কি আলেখ্য হইতে নামিয়া সোপানাবতরণ করিতেছে? বালিকাকণ্ঠের কলহাসি তাঁহার সে ভ্রম অপনোদন করিয়া দিল। বালিকা ছুটিয়া আসিয়া বয়োজ্যেষ্ঠার হস্ত ধারণ করিল। "দিদি, কত ফুল আনিয়াছি, দেখ!" বলিয়া অঞ্চল হইতে শুভ্রকুসুমপুঞ্জ পাটল সোপানোপরি ঢালিয়া দিল। বয়োজ্যেষ্ঠা মৃদুহাস্যে তাহার আনন্দের অভিনন্দন করিলেন। রমাপ্রসাদ সহস্র ইচ্ছাসত্বেও সে দিক হইতে অপরাধী চক্ষু ফিরাইয়া লইতে পারিলেন না। বিস্ময়ের সহিত তিনি সেই অনিন্দ্য-সুন্দর রূপরাশি দর্শন করিয়া পুলকে আপ্লুত হইলেন। চতুর্দ্দিকের এমন অজস্র অবারিত স্বভাবশোভার মধ্যে কৃষ্ণকুন্তলা, বিরলাভরণা এই কিশোরী মূর্ত্তিকে পাইয়া চিত্রশিল্পী রমাপ্রসাদ চিত্র-সম্পূর্ণতার চরম সার্থকতা অনুভব করিলেন।

ধীরে ধীরে সুন্দরী অবগাহনার্থ পুষ্করিণীতে অবতরণ করিলেন। পুষ্করিণীর কাল জলে আকণ্ঠ-নিমজ্জমানা রমণীর কুঞ্চিত-কেশকলাপাঞ্চিত মুখমণ্ডল ভ্রমর-ভার-বিকম্পিত শতদলের লীলা ধারণ করিল। বালিকা সোপানের উপর অঞ্চল-প্রান্ত-বিনির্মুক্ত

কুসুমরাশি দ্বারা ততক্ষণ মালা গাঁথিতেছিল। তাহার মালা গাঁথা শেষ না হইতেই তাহার দিদি তীরে উঠিলেন। আর্দ্র-বসনে সুন্দরীকে আরও সুন্দর দেখাইতেছিল বিখ্যাত চিত্র "সাইকীর স্নান" দেখিয়া রমাপ্রসাদ যে আনন্দের আস্বাদন করিয়াছিলেন, আজ এই জীবন্ত চিত্রে তাহার পরিপূর্ণতা দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইলেন। "সাইকীর স্নানে" যে সলাজ সম্ভ্রমের অভাব ছিল, গার্হস্থ্য জীবনের সহিত যেটুকু অসামঞ্জস্যের ভাব ছিল, তাহাই যেন কে এই বিপুল নিসর্গ-শোভারাশির মধ্যে তুলি দিয়া আঁকিয়া দিয়া গেল—যেন চিত্রখানিকে অনন্ত পরিপূর্ণতায় ঐশ্বর্য্যশালী করিয়া দিয়া গেল।

সোপানে উঠিয়া রমণী একবার ইতস্ততঃ চাহিয়া দেখিলেন, হঠাৎ রমাপ্রসাদের দিকে দৃষ্টি পতিত হইল। তখন ত্রস্ত চকিত ভাবে অথচ মৃদুপাদক্ষেপে অবশিষ্ট সোপান কয়েকটি অতিক্রম করিয়া যুবতী ও বালিকা কামিনী-বকুলোদ্যানের মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেলেন।

সন্ধ্যার অন্ধকার হৈমন্তিক গোধূলির সিন্দূর শোভা মুছিয়া দিল। জোনাকীর আলো বাপীতীরস্থ বেতস কুঞ্জের পুঞ্জীভূত অন্ধকারকে যেন সহস্র চক্ষু দিয়া বিদ্ধ করিয়া দিল। রমাপ্রসাদ চিন্তাবনত হৃদয়ে গৃহে গমন করিলেন।

নূতন পুকুরের ছবি রমাপ্রসাদের কল্পনার সবটুকু একেবারে অধিকার করিয়াছিল। সুতরাং ভোরের আলোকে পক্ষিকুল সাড়া দিবার পূর্ব্বেই রমাপ্রসাদ অলিন্দায় আসিয়া পদ-চারণা করিতে লাগিলেন। দূরের পাদপশ্রেণীর মধ্যে অমানিশার অন্ধকার তখনও নিবিড় ভাবে বিরাজ করিতেছিল। সমীরণ বিজন নিশার স্মৃতি বহিয়া যেন অলস হইয়া পড়িয়াছিল। উষার পূর্ব্বরাগের ন্যায় চারিদিক হইতে ফুলের মৃদুগন্ধ ভাসিয়া আসিতেছিল।

রমাপ্রসাদ বিজন কক্ষে ফিরিয়া আসিয়া নিজের পোর্টম্যাণ্টো হইতে রঙ তুলিকা প্রভৃতি চিত্র-সরঞ্জাম বাহির করিলেন। দীপা-লোকের সাহায্যে দেওয়ালের গায়ে কাঁটা মারিয়া একখানি ক্যানভাস্ খাটাইয়া লওয়া হইল। রমাপ্রসাদ তাঁহার ভগিনীপতি অমূল্যচরণের বাসায় অতিথি; অমূল্যচরণ শ্রীপুরের একজন উকীল; চিত্রবিদ্যার কোনও ধার তিনি ধারিতেন না; সুতরাং আশবাবের অভাবে যে অসুবিধা হইবে, তাহার জন্য রমাপ্রসাদ প্রস্তুত ছিলেন।

প্রভাতের আলোক যখন দ্বার ও গবাক্ষপথে প্রবেশ করিয়া রমাপ্রসাদের ক্যান্ভাসে পতিত হইল, তাহার পূর্ব্বেই তাঁহার রঙ ফলানো হইয়া গিয়াছিল! একান্ত একাগ্রতার সহিত তিনি অঙ্কনে প্রবৃত্ত হইলেন। দেখিতে দেখিতে সেই সরোবর, সেই

কামিনীকুঞ্জ, সেই বেতসবন, দূরের তালবৃক্ষরাজি, সন্ধ্যার স্বর্ণ-কিরীটি মেঘমালা, এ সকলই আঁকা হইয়া গেল। বেশীর ভাগে আঁকিলেন—দিগ্বলয়ের পার্শ্বে অস্পষ্ট একটি পাহাড়ের সারি, আর জলের মাঝে দুই একটি পদ্ম ও পদ্মকোরক। ললাটের স্বেদবিন্দু মুছিয়া নিকটে থাকিয়া, দূরে গিয়া নানা ভাবে পুনঃ পুনঃ চিত্রের প্রতি প্রশংসার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া শিল্পী তৃপ্তি অনুভব করিলেন। তাঁহার মোহন তুলিকাস্পর্শে জড়ের মধ্য হইতে একটি জীবন্ত প্রকৃতি ক্রমে সজাগ হইয়া উঠিতেছিল। রমাপ্রসাদের মন বিমল শান্ত পুলকে ভরিয়া উঠিল, সে পুলকামৃত বোধ হয় সমুদ্রমন্থনে কবি, চিত্রকর, আর ভাস্করের ভাগ্যেই পড়িয়াছিল!

রমাপ্রসাদ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এইবার তাঁহাকে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে। সোপানোপরি সিক্ত বসনে দণ্ডায়মানা, মুক্ত-কেশ-কলাপ-শোভনা বিরলাভরণা কোমলকরচারুচরণা সেই মানসী সুন্দরীকে আঁকিতে পারিলে তাঁহার চিত্র সম্পূর্ণ ও জন্ম সার্থক হয়। রমাপ্রসাদ অতি নিবিড় ভাবে সে মূর্ত্তি ধ্যান করিতে লাগিলেন। তুলিকা হস্তে উদ্যত হইয়া আছে, কল্পনার মধুরতায় মন ভরিয়া গিয়াছে, সে চিরসুন্দর প্রশান্ত দৃষ্টির সুষমায় সৌন্দর্য্যপাগল রমাপ্রসাদের চিত্ত বিভোর হইয়াছে, কিন্তু অঙ্কনারম্ভ হইতেছে না। তিনি সে শুভ মুহূর্ত্তের আশায় অনেকক্ষণ কাটাইলেন, কিন্তু সে আসিতে বড়ই বিলম্ব করিতে লাগিল। এই

যে কল্পনা ও চেষ্টার মধ্যে কলহ, এটি আর কখনও রমাপ্রসাদের জীবনে ঘটে নাই। তিনি যতই সে সুন্দরীর রূপ ধ্যান করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার মনে একটি অনাস্বাদিতপূর্ব্ব সুখের অনুভূতি জাগিয়া উঠিতে লাগিল। এ সুখের সহিত কলানুশীলনের নির্ম্মল স্বার্থলেশশূন্য আনন্দের যে কোন সম্বন্ধ নাই, তাহা প্রথমে রমাপ্রসাদ বুঝিতে পারেন নাই। সেই যে চকিত চাহনি, সেই যে বিলাস-ভঙ্গিমা, শিল্পীর চিত্তে তাহা সৌন্দর্য্যের আকর, চির পবিত্র, চির নির্ম্মল। আজ যে তাহার মধ্যে একটি মাদকতা আসিয়া পড়িয়াছে—সে অনাবিল অচঞ্চল পল্বলে যে তরঙ্গ উঠিয়াছে! চিত্রাঙ্কন কিছুতেই আর অগ্রসর হইতে চাহে না দেখিয়া রমাপ্রসাদ তুলিকা ত্যাগ করিলেন! বাহিরে গিয়া অনেকক্ষণ পদচারণা করিলেন, তাঁহার নেশা ছুটিল না। তখন বুঝিলেন যে, তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহার চিত্রকলা সেই সন্ধ্যাবেলায় পুকুরের জলে ডুবিয়া মরিয়াছে।

রমাপ্রসাদ অবিবাহিত। জীবনে বিবাহটা যে একটা প্রকাণ্ড অন্তরায় ব্যতীত অন্য কিছু, তাহা এই কলানুশীলনরত যুবকের ধারণায়ই আইসে নাই। কাজেই শুভবিবাহের সে অশুভ ব্যাপারটিকে দূরে রাখিবার জন্য তিনি প্রথম হইতেই বদ্ধপরিকর

হইয়াছিলেন। তাঁহার জননী পুত্রের প্রকৃতি জানিতেন; পুত্র-বধূর মুখদর্শনে লালায়িত থাকিলেও তিনি পুত্রের বিরক্তির আশঙ্কায় সে সাধ মনেই চাপিয়া রাখিতেন। অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া, কলাবিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত হইয়া সৌম্যমূর্ত্তি কুলীন-কুমার রমাপ্রসাদ যে কত কন্যার জনকের লুব্ধ আশাকে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই।

রমাপ্রসাদ এতদিন যে রূপ-সাগরে ভাসিতেছিলেন, তাহার তরঙ্গ-দোলায় তিনি মনের সুখে দোল খাইতেই অভ্যস্ত ছিলেন। যুবক আজ প্রথম সেই তরঙ্গের অভিঘাতে ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন! যে রূপের অর্চ্চনায় এতদিন তিনি বিভোর হইয়াছিলেন, আজ সে রূপের তৃষ্ণা শতফণা তুলিয়া তাঁহার হৃদয়কে ঘিরিয়া ফেলিল। যৌবনের মলয়স্পর্শে আজ তাঁহার স্ফুরিত প্রেম-কুসুম কাঁপিয়া নাচিয়া উঠিল। তিনি বুঝিলেন যে, অবিবাহিত অবস্থাটি দেব-বাঞ্ছিত হইলেও নিরাপদ নহে। বন্ধনশূন্য, দায়িত্বহীন জীবন যে সুখের, সে বিষয়ে সন্দেহ কি! স্বাধীনতা কে না ভালবাসে? কিন্তু স্বাধীনতায় বিপদ অনেক।

রমাপ্রসাদের চিন্তা এইরূপে একটা নৈতিক দায়িত্বের দিকে প্রবাহিত হইতেছিল। অবশ্য এমন অবস্থায়, একটা নূতন আবেগে, বিশেষতঃ যৌবনের উদ্দাম তরঙ্গে মানুষের হৃদয়ে সহসা ভাবপ্রবণতা বা Sentimentalityর আবির্ভাবই হইয়া থাকে। রমাপ্রসাদ যে

সন্ধ্যার সমীর-চঞ্চল বাপী-তটে, আলো ও ছায়ার গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমে "চিত্রার্পিতারম্ভ ইব" অনাবৃত্ত যৌবন-শ্রী দেখিয়া আসিয়াছিলেন, তাহাতে যে তাঁহার হৃদয় অপ্রকম্পিত ছিল, তাহা নহে। কিন্তু তাঁহার স্বভাব-স্থির চরিত্রের মধ্যে সে আকর্ষণ বিদ্যুৎ-ফলকের ন্যায় চকিতে ঝলকিয়া মিলাইতেছিল। বিদ্যুচ্চমকিত গগনের ন্যায় তাঁহার হৃদয়ও এক প্রকার শূন্যতার দ্বারা প্রপীড়িত হইতেছিল। সেই জন্যই বোধ হয় রমাপ্রসাদ তাঁহার চরিত্র-ভাণ্ডার হইতে একটি নৈতিক বল আহরণ করিয়া, আগ্রহের সহিত তাহাকে চাপিয়া ধরিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার দোলায়মান চিত্ত তাঁহাকে বুঝাইয়া দিল যে, চিত্তকে না বাঁধিয়া ফেলিলে আর চলে না। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, এবারে জননীর সাধ পূর্ণ করিতে হইবে—বিবাহ করিতে হইবে। নিজের প্রতি যে কর্ত্তব্য, তাহা জননীর প্রতি কর্ত্তব্যে নির্ভর করিয়া বল সঞ্চয় করিল।

রমাপ্রসাদ এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে অলিন্দায় পদচারণা করিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার ভগিনীপতি অমূল্যচরণ আসিয়া তাঁহার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া কহিলেন ;—

"কিহে চিত্রকর মহাশয়, কি কল্পনা হইতেছে? একটা কিছু মনে পড়ে গেছে বুঝি?"

রমাপ্রসাদ কহিলেন, "এমন কিছুই নহে।"

অমূল্যচরণ জিজ্ঞাসিলেন, "তবু? এই যে ঘণ্টাখানেক পায়চারি

করিয়া আমার এই বারান্দার ইষ্টকগুলিকে ক্ষয় করিয়া দিলে, ইহার একটী প্রত্যক্ষ ফল ত চাই?”

রমাপ্রসাদ বিপন্ন ভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন। অমূল্যচরণ বুঝিলেন যে, কল্পনার মদিরা মস্তিষ্কে যে বিপ্লব বাধাইয়াছে, তাহা এখনও কাটিয়া যায় নাই। রমাপ্রসাদের প্রতিভা-সম্বন্ধে তাঁহার উচ্চ ধারণা ছিল; এখন তাঁহাকে এইরূপ বিমনা দেখিয়া তিনি আদরের সহিত বলিলেন;—

“আচ্ছা বুঝা গেছে, নূতন পুকুরের ছবি ত কাঁটামারা পড়ে আছে, রঙ তুলিকা গড়াগড়ি যাচ্চে, তোমারও দেখ্‌ছি, কল্পনার গঙ্গায় জোয়ারের জোর টান পড়েছে! বলি, আজ যে ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া, সেটা মনে আছে ত? সে বেচারীরা যে উপবাসী রয়েছে।”

এতক্ষণে রমাপ্রসাদের ধ্যান-ভঙ্গ হইল। তিনি ত্বরিত পদে স্নানার্থ গমন করিলেন।

শরতের অপরাহ্নে যেমন মেঘাবরণ অপসারিত হইয়া প্রশান্ত নির্ম্মল গগন দেখা দেয়, রমাপ্রসাদের মন তেমনই নিমন্ত্রণ-ব্যাপারে তাঁহার চিন্তা-জাল অপসারিত করিয়া পুনর্ব্বার স্বাভাবিক প্রফুল্লতা লাভ করিল। নিমন্ত্রণ বাড়ীতে তাঁহার হাস্য-চপলতায় সকলে মুগ্ধ হইলেন। অমূল্যচরণের ঠাকুরদাদা (দূর-সম্পর্কীয়) চন্দ্রকান্ত

রমাপ্রসাদের আলাপে অল্পক্ষণেই সন্তুষ্ট হইলেন। শ্রীপুরে চন্দ্রকান্ত বাবু অমায়িক ব্যবহারের জন্য প্রসিদ্ধ। যুবা, বালক, বৃদ্ধ সকলেই তাঁহার পরিহাস-রসিকতার অংশ সমানভাবে পাইত। পথে কাহারও সহিত হঠাৎ দেখা হইলে, তিনি তখনই তাঁহাকে গানের দুই একটি "কলি" বা পদাবলীর কোমল মধুর দুই একটি চরণ শুনাইয়া দিতে ছাড়িতেন না। বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার গলাটি বড় মিষ্ট ছিল। একটি সম্পূর্ণ গান করিতে তাঁহাকে কেহ কখনও শুনিয়াছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু সম্ভাষণ কিম্বা আপ্যায়িত করিবার জন্য তাঁহার সুমিষ্ট কণ্ঠ সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত। রমাপ্রসাদ কিছুক্ষণ তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়া অতিশয় পরিতৃপ্ত হইলেন।

চন্দ্রকান্ত বাবু রমাপ্রসাদকে শাসাইতে ছিলেন যে, "বিবাহের সানাই যেদিন বাজিয়া উঠিবে, সেই দিন তোমার চিত্রকলাকুতুকিনী কল্পনা কোথায় থাকে দেখা যাবে!

'দেখ্‌ব তোমার নাগরালী পরেতে,

ওহে শ্যাম, শ্যাম হে আমার।'

দেখ বিবাহের আগে সব মানায় হে, সব মানায়! তারপরে, বুঝেছ ভায়া, অন্য আসরে অন্য পালা! এত দিন যার যে খেলা, ঐখানে গিয়ে কিস্তী পড়ে।"

রমাপ্রসাদ এতক্ষণে বিবাহের সম্বন্ধে ভাঙ্গিয়া গড়িয়া একটা

মত স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন; কাজেই এই পরিহাসে তিনি হটিবার লোক নহেন। তিনি বৃদ্ধকে বলিলেন,—

"দাদা মহাশয় কি জানেন, তেমনি যদি একজন অর্দ্ধাঙ্গিনী ভাগ্যে জুটে যায়, তবে জোয়ারে পাল পাওয়া যায়।"

"কিন্তু সে বড় ভাগ্যের কথারে ভায়া, সে বড় ভাগ্যের কথা।" বলিয়া দাদা মহাশয় আবার গান ধরিলেন,—

"মানুষ কি কথায় ধরা যায়
মনে প্রাণে ঐক্য হয়ে নির্জ্জনে সাধন করতে হয়।

দেখ রমাপ্রসাদ, তোমাদের দিদিমা—সে কথা মনে হ'লে—আহা কি সাধনার ফলেই লাভ করে ছলাম!" এবারে বৃদ্ধের নয়ন-পংক্তি আর্দ্র হইয়া আসিল।

তাঁহাদের মধ্যে এইরূপ আলাপ চলিতেছিল, এমন সময়ে বৃদ্ধের পুত্র সেখানে আসিলেন। বৃদ্ধ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"আর দেরী কি?"

রজনীকান্ত বলিলেন, "আর দেরী নাই। অমূল্য ফোঁটা নিচ্চে; ফোঁটা দেওয়া হলেই খাবার দেওয়া হবে।"

বৃদ্ধ বলিয়া উঠিলেন, "রমাপ্রসাদকেও নিয়ে যাওনি কেন? রমাপ্রসাদও যে ফোঁটা নেবে।"

রজনী বলিলেন "মণি দেবে কিনা, তাই—"

বৃদ্ধ একটু উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "তা'তে কি? আজকার

দিনে কি সঙ্কোচ করতে আছে? আমাদের অমূল্যও যেমন, রমাপ্রসাদও তেমনি। বোধ হয় সহোদরের মধ্যেও এর চেয়ে বেশী ভাব হয় না। আর দেখ, আমাদের এই ভাই ফোঁটার অনুষ্ঠানটির তুলনা হয় না। এর মধ্যে এত ভালবাসা, এত ভক্তি রয়েছে যে, এটা আমাদের একটা গৌরবের সামগ্রী। আমার বোধ হয় আর কোনও জাতির মধ্যে এমন সুন্দর ভাই ভগিনীর মিলনের উৎসব নাই! এই যে বৎসরান্তে ভাই ভগিনীর সঙ্গে একটা স্নেহ-সম্ভাষণের সুযোগ বাঙ্গালীর ভাগ্যে ঘটে, এর তুলনা নাই হে, এর তুলনা নাই। রমাপ্রসাদকেও নিয়ে যাও; এর ভগিনী এখানে নাই মনে রেখো।"

বৃদ্ধের কথায় এবং ভগিনীর কথা মনে হওয়ায়, রমাপ্রসাদের হৃদয়ে একটু বিষাদের ছায়া পড়িল। তাহা হইলেও রজনীকান্ত যখন তাঁহাকে ডাকিলেন, তখন তিনি বলিলেন,—

"তা' হোক দাদা মহাশয়, আমি না হয় পরে যাচ্ছি। আসল ব্যাপারটিতে বিস্মরণ না হ'লেই হ'ল। বুঝ্‌লেন কি না?"

"তা'ও কি হয়!" বলিয়া দাদা মহাশয় গাত্রোত্থান করিয়া খড়ম পায়ে দিলেন ও রমাপ্রসাদের হস্ত দুইখানি ধরিয়া অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন।

দুইখানি গালিচার আসনের পুরোভাগে শ্বেত পাথরের

রেকাবীতে নানাবিধ মিষ্টান্ন ও ফলমূল সাজান রহিয়াছে। অমূল্যচরণ নববস্ত্রে সজ্জিত হইয়া উপবিষ্ট, আর একটি পঞ্চদশবর্ষীয়া বালিকা গললগ্নীকৃতাঞ্চলে তাঁহার অর্চ্চনা করিতেছেন। রমাপ্রসাদ দ্বারদেশে আসিয়াই চমকিয়া উঠিলেন ও বৃদ্ধের হস্ত হইতে আপনার হস্ত মুক্ত করিয়া পশ্চাতে সরিয়া গেলেন। রজনীকান্ত পশ্চাতে আসিতেছিলেন, বলিলেন "চল।"

"ছেলেটি বড় অবাধ্য।" বলিয়া বৃদ্ধ পুনর্ব্বার রমাপ্রসাদের হস্ত ধরিয়া লইয়া গেলেন। অর্চ্চনশীলার চক্ষু রমাপ্রসাদের দিকে পতিত হইল, সে স্থির অচঞ্চল চক্ষুতে নিমেষের জন্য একটু অলসতরলতা দেখা দিয়াছিল কিনা রমাপ্রসাদ তাহা লক্ষ্য করিবার অবসর পান নাই। যে রূপমদিরা তাঁহাকে এতক্ষণ বিভোর করিয়া রাখিয়াছিল, এই নূতন অঙ্কে যে আবার তাহারই পুনরভিনয় হইবে, সে জন্য তিনি একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁহার মনে সহসা যে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল এবং তাহার ফলে তাঁহার মুখমণ্ডলে যে রক্তিমচ্ছটা বিকশিত হইয়াছিল, তাহা সম্ভ্রম ও বিনয়ের লক্ষণ মনে করিয়া চন্দ্রকান্ত প্রীতি অনুভব করিলেন। তিনি তাঁহার নবমবর্ষীয়া পৌত্রীকে বলিলেন "সরি, এইবারে একটা ধুতি চাদর তোর এই দাদাকে এনে দে।"

সরোজিনী অমূল্যচরণের পার্শ্বেই বসিয়াছিল; আজ্ঞা পাইবামাত্র সে অন্য ঘরে গিয়া তখনই নূতন বস্ত্র লইয়া ফিরিয়া

আসিল। সরোজিনীর মাতা রমাপ্রসাদের জন্যও বন্দোবস্ত করিতে ভুলেন নাই, অন্তরাল হইতে তাঁহাকে আসিতে দেখিয়াই তিনি ধুতিচাদরটি হাতে করিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন।

রজনীকান্ত কন্যার হস্ত হইতে বস্ত্র লইয়া রমাপ্রসাদকে দিলেন। রমাপ্রসাদ ইহার জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি ইতস্ততঃ করিতেছেন দেখিয়া সরোজিনী তাহার পিতার হস্ত ধরিয়া, তাঁহার মুখের উপরে চক্ষু রাখিয়া বলিল, "বাবা কাপড় ছাড়িতে হয় যে।" রমাপ্রসাদ বুঝিলেন যে, এই "ছাড়িতে হয়" এর বিরুদ্ধে আপীল চলে না। নূতন বস্ত্র লইয়া তিনি দরজার বাহিরে গেলেন ও যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতার সহিত বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া ফিরিলেন। তিনি যখন আসনে উপবেশন করিলেন, তখন অর্চ্চনরতা ভক্তিভরে অমূল্যচরণকে প্রণাম করিতেছিলেন। রমাপ্রসাদের মনে পড়িল সেই চিত্র—যেখানে একস্বসৌন্দর্য্য-দিদৃক্ষার অপূর্ব্ব সৃষ্টি গৌরী ধ্যান-নিমীলিত নেত্র মহাদেবের কণ্ঠে পদ্মের বীচির মালা পরাইয়া প্রণিপাত করিতেছেন। সে সময়ে তাঁহার নীলালকমধ্যশোভি-কর্ণিকার কুসুম ও কর্ণোপান্ত-শোভি-কিশলয় বিস্রস্ত হইয়া মহাদেবের চরণে পড়িয়াছিল, আর তাঁহার নিতম্বাবলম্বি-কেশর-দামকাঞ্চী পুনঃ পুনঃ খসিয়া পড়িতেছিল। রমাপ্রসাদ এইরূপ চিন্তায় উন্মনায়মান হইতেছিলেন, এমন সময়ে দাদা মহাশয় বলিলেন,—

"বাঃ এইবার কেমন মানাইয়াছে, দেখ দেখি। যেন কার্ত্তিকটি। এই নূতন বস্ত্র পরাই ত ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার উৎসব। এটি বাদ দিলে চলিবে কেন?"

রমাপ্রসাদ তাঁহার মানসিক বিদ্রোহ গোপন করিবার সুযোগ পাইয়া উৎসাহের সহিত দাদা মহাশয়ের সঙ্গে আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন—

"দাদা মহাশয়, ভগ্নীকে আশীর্ব্বাদ করিতে গেলে কার্ত্তিক সাজিতে হয়?"

"কার্ত্তিক সাজা—কি জান? ওটা চেহারার উপর নির্ভর করে। বিবাহে আমায় নিমন্ত্রণ করিস্, ভাই, মনের মত করিয়া সাজাইয়া দিয়া আসিব।"

অমূল্যচরণ বলিলেন, "দাদা মহাশয়, ও যে নিজেই একজন রুচির সওদাগর; বিবাহের সময় কি আর পরের কাছে সাজিতে যাবে, নিজেই মনের মত করিয়া সাজিয়া লইবে।"

দাদা মহাশয় বলিলেন, "তা বটে, কিন্তু ঐসময়ে সকলেরই রুচির জাহাজ ডুবি হয়ে যায়! যত বড়ই সওদাগর হও, তখন পরের নিকট সাধ করে ঋণী হ'তে হ'বে, বুঝলে হে ভায়া। সে বড় বিষম ঠাঁই। একটা গান মনে পড়ে গেছে,—থাক্ পরে হবে এখন।"

রজনীকান্ত ও অমূল্যচরণ একটু হাসিলেন।

যতক্ষণ কথোপকথন হইতেছিল, ততক্ষণ সরোজিনী

রমাপ্রসাদকে ফোঁটা পরাইতে ব্যস্ত ছিল। সে যথারীতি অর্চ্চনা করিয়া রমাপ্রসাদকে প্রণাম করিল এবং দুই হস্তে খাবারের রেকাবী তুলিয়া তাঁহার হস্তে দিল। রমাপ্রসাদ চন্দনের পাত্র হইতে ধান্য ও দূর্ব্বা লইয়া সরোজিনীকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

সরোজিনীর দিদি, অমূল্যচরণকে ফোঁটা দিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিল, এমন সময়ে চন্দ্রকান্ত বলিলেন,—

"মণি, তুমিও একটি ফোঁটা দিয়া যাও। আহা কত ভাগ্য!"

মণি প্রথমতঃ একটু থতমত খাইল। পরক্ষণেই স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্য্যের সহিত চন্দনের পাত্র হস্তে লইয়া ধীরে রমাপ্রসাদের নিকট গেল। চন্দ্রকান্ত বলিলেন "মণিমালা আমার দৌহিত্রী। এরা খুব কুলীন। অভাগিনীর মা নাই!"

বৃদ্ধের স্বর কাঁপিয়া গেল। রমাপ্রসাদ করুণ নেত্রে মণিমালার দিকে চাহিলেন। তাহার দৃষ্টি ভূতলে নিবদ্ধ ছিল, সুতরাং রমাপ্রসাদ দেখিতে পাইলেন না যে মণিমালার চক্ষু শিশিরভারনত শেফালির মত আর্দ্র ও কোমল হইয়া আসিয়াছিল!

বাল্য ও যৌবনের মধ্যবর্ত্তিনী, পুষ্পিতবল্লরীর ন্যায় লাবণ্যময়ী মূর্ত্তিকে সম্মুখে দেখিয়া রমাপ্রসাদ হৃদয়ের মধ্যে এক প্রকার অননুভূতপূর্ব্ব ভাব অনুভব করিতেছিলেন। সে মূর্ত্তির মধ্যে এমন একটা সামঞ্জস্যের ভাব ছিল, এমন একটা অনুকূল সৌম্যস্নিগ্ধ

গম্ভীরতা ছিল যে, তাহাতে রমাপ্রসাদের মন ভরিয়া গিয়াছিল। মণিমালার দীর্ঘকেশরাশি পৃষ্ঠদেশে বিলম্বিত হইয়াছে, কণ্ঠার্পিত অঞ্চলপ্রান্ত বিদ্রোহী অলকরাজিকে দমন করিতে কদাচিৎ সমর্থ হইয়াছে। শিল্পী রমাপ্রসাদ মনে মনে সঙ্কল্প করিতেছিলেন যে, এইবারে একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিতে হইবে যে তাঁহার ব্যর্থ চিত্র সম্পূর্ণ হয় কিনা।

বৃদ্ধ চন্দ্রকান্ত বলিলেন,—

"ভায়া মণিমালার একটি ছবি আঁকিয়া দিতে পার ত বুঝি তুমি কেমন চিত্রকর! সত্যই আমার বড় ইচ্ছা যে, দিদিমণির একখানি ভাল ছবি করিয়া ঘরে রাখিয়া দি'। দু' দিন পরে ত ও আমাদের ছাড়িয়া যাইবে।"

রমাপ্রসাদ চমকিয়া উঠিলেন। কখনও কখনও নিজের মনের কথা অপ্রত্যাশিত রূপে অন্যের মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়ে, তখন বিস্ময় ও লজ্জায় অভিভূত হইয়া পড়িতে হয়। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, মনের ছায়া কি কখনও কখনও বাহিরে পড়ে?

রমাপ্রসাদ চন্দ্রকান্তের কথায় কি উত্তর দিবেন খুঁজিয়া পাইতেছেন না, তিনি অন্যমনস্ক ভাবে পাত্র হইতে একটি মিষ্টান্ন তুলিয়া লইয়া মুখে দিবার যোগাড় করিতেছিলেন, এমন সময় ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে মণিমালা বলিল,—

"এখনও যে ফোঁটা দেওয়া হয় নি!"

অপ্রতিভ হইয়া রমাপ্রসাদ মিষ্টান্নটি রাখিয়া দিলেন। সরোজিনী উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। অমূল্যচরণ ও চন্দ্রকান্ত উৎসাহের সহিত সে হাস্যে যোগদান করিলেন।

অমূল্যচরণ বলিলেন, "রমাপ্রসাদ সময়ে সময়ে অন্যমনস্ক হইয়া যায়। কাল থেকে আপনাদের নূতন পুকুরের ছবি আঁকা হইতেছে। আজ সকালে ত তাহার চৈতন্যই ছিল না যে, এখানে আসিতে হইবে। সেই জন্যই ত এত দেরী হয়ে গেল।"

রমাপ্রসাদ দেখিলেন যে, মণিমালা নূতন পুকুরের ছবির কথায় একটু বিচলিত হইয়া উঠিল। ফোঁটা দিবার সময়ে তাহার হস্ত কাঁপিয়া গেল। এবং সে একটী গর্হিত কাজ করিয়া বসিল—দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীর দ্বারা ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে একটি ফোঁটা পরাইয়া দিয়াই প্রণাম করিল এবং নিমেষের মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

আর কেহ লক্ষ্য করিলেন না কিন্তু সরোজিনী তাহার মা'কে গিয়া বলিয়াছিল যে, "দিদি রমাপ্রসাদকে ফোঁটা দিতে গিয়া ভুল করিয়াছে। সে বাম হস্তের কনিষ্ঠ অঙ্গুলি দিয়া ফোঁটা দেয় নাই।"

মণিমালা হাসিয়া বলিলেন, "সকলে যে রকম আরম্ভ করিলেন, তাহাতে কি কিছু ঠিক রাখা যায়?"

সরোজিনীর মাতা ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করিলেন।

রমাপ্রসাদ সেই রাত্রেই তাঁহার ভগিনী মনোরমার নিকট একখানি পত্র লিখিলেন। তাহাতে তিনি জানাইলেন যে, মাতার অনুরোধ উপেক্ষা করা যে তাঁহার পক্ষে অন্যায় হইতেছে তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন এবং সেই জন্য বিবাহ করিতে আর তাঁহার আপত্তি নাই।

মনোরমা মাতাকে জানাইলেন; তাঁহার অশ্রু উথলিয়া উঠিল এবং পুত্রের উদ্দেশে অজস্র করুণা ও আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিল। মনোরমা একবার কেবল মাতার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাদার শ্রীপুরে গিয়ে কি হয়েচে ?"

মাতা বলিলেন, "কি আবার হবে ? লেখাপড়া শেষ হয়েচে, এখন ছেলে বুঝ্‌তে শিখেচে যে সংসারী হ'তে হ'লে বিয়ে কর্‌তে হয়।"

মনোরমার মনে অলক্ষিতে একটু সন্দেহের কণ্টক এবং অধর-প্রান্তে একটু হাসির রেখা রহিয়া গেল।

রমাপ্রসাদের মাতা রমাপ্রসাদকে বাড়ী আসিবার জন্য চিঠি লিখিলেন, কিন্তু সে চিঠি শ্রীপুরে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই রমাপ্রসাদ কলিকাতায় রওনা হইয়াছিলেন।

সেই ডাকে মনোরমাও অমূল্যচরণকে এক চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিয়া তিনি হাস্য সংবরণ করিতে পারিলেন না। সে চিঠিতে মনোরমা এইরূপ আভাস দিয়াছেন যে,

অমূল্যচরণের বাতাস গায়ে লাগিয়াই তাঁহার বিবাহ-ভীত ভাইটির মত পরিবর্ত্তন হইয়াছে অথবা শ্রীপুরে কোনও রমণীর প্রেমে সে শুষ্ক মালঞ্চে বিবাহের ফুল ফুটিয়াছে। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার ঘটনার সহিত ইহার কোনও সম্বন্ধ আছে কিনা এই চিন্তা করিয়া অমূল্যচরণ একটু গম্ভীর হইলেন।

রমাপ্রসাদ তাঁহাদের কলেজের অধ্যক্ষ-কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া সরকারী ব্যয়ে নানাস্থানের চিত্র-সংগ্রহ দেখিবার জন্য রওনা হইলেন। মুরশিদাবাদ, লক্ষ্ণৌ, আগরা প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়া তিনি অনেক দিন পরে হায়দ্রাবাদে উপনীত হইলেন। তাঁহার আরও দক্ষিণে যাইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাঁহার মাতার একখানি চিঠি পাইয়া তাঁহার মন গৃহের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সুতরাং বাঙ্গালী যুবকের ভ্রমণ আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিল না। তিনি সেবারকার মত গৃহে ফিরিলেন।

তাঁহার মাতা তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন যে, তাঁহার বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে, ফাল্গুন মাসের মধ্যে বিবাহ দিতেই হইবে, কন্যাপক্ষের এইরূপ নির্ব্বন্ধ। চৈত্র মাসে কন্যার দ্বাদশ বর্ষ পূর্ণ হইবে সুতরাং বিলম্ব করিতে তাঁহারা একান্তই অপারক।

তাঁহার মাতা আরও লিখিয়াছেন যে, এই বিবাহ লইয়া

অমূল্যচরণের সহিত তাঁহার একটু মত-বৈষম্য উপস্থিত হইয়াছে। অমূল্যচরণ এক সম্বন্ধ উপস্থিত করিয়াছিলেন; সে মেয়েটি তত ভাল নহে, তাহাতে আবার দরিদ্র। কোনও মতে সে কার্য্য হইতে পারে না। তিনি যে সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন সে খুব ভাল। মেয়েটি পরমা সুন্দরী, অবস্থাও ভাল, কুলে শীলে সমস্ত বিষয়ে এই সম্বন্ধই বাঞ্ছনীয়। রমাপ্রসাদ বাড়ী ফিরিয়া এই বিষয় মীমাংসা না করিলে, হয়ত অমূল্যচরণের সহিত মনোমালিন্য ঘটিতে পারে।

রমাপ্রসাদ পত্র প্রাপ্তিমাত্র লিখিলেন যে, তাঁহার মাতা যে সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার অভিপ্রেত। অমূল্যচরণকে বুঝাইয়া বলিলেই চলিবে। পত্র পাইয়া তাঁহার মাতা পুলকে ও স্নেহে অধীর হইলেন। তাঁহার মত পুত্র সংসারে ক'জনের ভাগ্যে ঘটে, ইহা মনে করিয়া তিনি গর্ব্বও অনুভব করিলেন।

বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল। কিন্তু অবধারিত দিনের পূর্ব্বে রমাপ্রসাদ কিছুতেই আসিয়া উঠিতে পারিলেন না। তিনি যে সকল স্থানে গিয়াছেন, তাহার একটি সচিত্র বিবরণ দাখিল করিয়া না দিলে, তিনি ছুটি পাইবেন না। এই বিবরণ লিখিবার জন্য আসিবার পথে কোনও কোনও স্থানে তাঁহাকে আবার নামিতে হইল। এইরূপে বিলম্ব হইয়া গেল। কলিকাতায় আসিয়া তিনি লিখিলেন যে, নির্দ্ধারিত দিনে উপস্থিত হওয়া একান্ত অসম্ভব।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।

ফাল্গুন মাসের আর এক সপ্তাহ মাত্র অবশিষ্ট আছে; তাঁহার মাতা চিন্তিত হইলেন। রমাপ্রসাদ গৃহে ফিরিবার পরই তাঁহার মাতা দিন স্থির করিয়া কন্যাপক্ষকে সংবাদ দিলেন। পরদিন মনোরমাকে সঙ্গে লইয়া অমূল্যচরণ আসিলেন। রমাপ্রসাদ দেখিলেন, তাঁহারা উভয়েই কিছু বিমর্ষ। মনে করিলেন, তাঁহার মাতার ব্যবহারে যে বিষাদ কালিমা পড়িয়াছে, বিবাহের পরে নিজের ব্যবহারে তাহা ধৌত করিয়া দিবেন। কিন্তু বিবাহে এক বাধা পড়িয়া গেল।

কন্যাপক্ষের নিকট যে পত্রবাহক গিয়াছিল, সে আসিয়া সংবাদ দিল যে সে কন্যার বিবাহ অন্যত্র হইয়া গিয়াছে। রমাপ্রসাদের মাতা ক্ষোভে, লজ্জায় অধীর হইলেন। মনোরমার কৌতুকপ্রবণ হৃদয়ে একটু হাসির হিল্লোল বহিল। তিনি অমূল্যচরণকে ডাকিয়া পরামর্শ করিলেন। পরে অমূল্যচরণ ও মনোরমা উভয়ে মাতার নিকটে উপস্থিত হইলেন।

অমূল্যচরণ বলিলেন, "মা, যদি এই অপমানের হস্ত হইতে বাঁচিতে চান, তবে আর বিলম্ব না করিয়া বিবাহটা দিয়ে ফেলুন।"

মনোরমাও ধীরে ধীরে সেই কথার সমর্থন করিলেন। তাঁহার মাতা বলিলেন, "তাইত বাবা, আমি এখন কি করি, লোকে আমাকে কি বলিবে, ছেলেই বা কি মনে করিবে! আমি সাত সমুদ্র পার থেকে জেদ করিয়া তাহাকে বাড়ীতে লইয়া আসিলাম

শুধু কি এই কথা শুনাবার জন্যে? হায় হায়, দর্পহারী আমার দর্প চূর্ণ করেছেন।"

অমূল্যচরণ বলিলেন, "যাক্, এখন আর দুঃখ করিয়া কাজ নাই। গরীবের মেয়ের সঙ্গে যদি কাজ করিতে রাজি থাকেন, তবে বলুন, আমি যোগাড় করি। সময় যে অল্প!"

"হাঁ বাবা, তারা কি বড় গরীব?"

"না মা, বড় গরীব কে বলিল? তবে বড়মানুষ নয়।"

"তা হোক, বড়মানুষ আর আমি চাই না। মেয়েটি দেখিতে কেমন?"

"মন্দ নয়, তবে যেটি হাতছাড়া হইয়া গেল, তেমন কি আর?"

"তুমি তা' হ'লে দেখেছ বাবা? বড় ভাল মেয়ে, বড় ভাল মেয়ে, অমনটি আর হয় না! ঐ জন্যই সে কাজ করিতে আমার এত আকিঞ্চন ছিল।"

মনোরমা একটু হাসিয়া বলিলেন "না মা, এ মেয়েও খুব সুন্দরী।"

অমূল্যচরণ বলিলেন "এ মেয়ে যদি তত ভাল নাই হয়, কিন্তু আর পাচ্ছি কোথা? আপনি যদি মত করেন, তবে এখনই বলুন। বিলম্ব করিলে সব গোল হইয়া যাইবে। এ মাসে আর একটি মাত্র ভাল দিন আছে।"

মনোরমার মাতা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "তবে তাই

হোক্! তুমি যখন স্থির কর্‌ছ, তখন আমায় কিছু দেখতে হবে না।"

অমূল্যচরণ একটু হাসিলেন। তিনি সেই রাত্রেই রওনা হইয়া গেলেন।

ফাল্গুনমাসের শেষ রজনী। জ্যোৎস্না ও ফুলগন্ধে জলস্থল আকুল হইয়া উঠিয়াছে। সানাইয়ের তান বসন্ত বায়ুর সহিত মিশিয়া দূরে—অতিদূরে আনন্দের সংবাদ বহন করিতেছে।

রমাপ্রসাদ বাসন্তীরঙের ক্ষৌমবাসে সজ্জিত হইয়া বরাসনের উপর এক অধীর প্রতীক্ষা লইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। যখন শুভ সপ্তবার প্রদক্ষিণ শেষ হইল, তখন অমূল্যচরণ নিজহস্তে ঝালোর পরিশোভিত আবরণবস্ত্র বরকন্যার মস্তকের উপর বিলম্বিত করিয়া দিলেন। বাঁশী আরও মোহন সুরে গাহিল; বধূর অবগুণ্ঠন অমূল্যচরণই আচ্ছাদনের বাহির হইতে হস্ত প্রসারিত করিয়া উন্মোচন করিলেন। রমাপ্রসাদ একবার চাহিয়াই চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। তাঁহার অজ্ঞাতসারে অস্ফুটস্বরে উচ্চারিত হইল "মণিমালা!—"

যাহার স্মৃতি এতদিন তাঁহার প্রাণে একটি মধুর বেদনার মত থাকিয়া থাকিয়া জাগিয়া উঠিত, হেমন্ত সন্ধ্যার স্বর্ণসমুজ্জ্বল কান্তিতে

বিকশিত যে রূপরাশি একদিন তাঁহার সমস্ত কলাকল্পনাকে মুগ্ধ করিয়াছিল—সেই মণিমালা? রমাপ্রসাদ সমস্ত হৃদয় দিয়া এই সুন্দরী রমণী-মূর্ত্তির যে অর্চ্চনা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে কামনা ছিল না। কাজেই তিনি সে ভাবে মণিমালার দিকে কখনও চাহিয়া দেখেন নাই। মণিমালা যে কুমারী এই সামান্য তথ্যটি লইতেও কখনও তাঁহার ইচ্ছা হয় নাই। এখন তাঁহার মনে পড়িল যে, তিনি কখনও মণিমালার সীমন্তে সিন্দূর ত দেখেন নাই।

অমূল্যচরণ এতদিন যে একটা গোপনতার আবরণে এই ব্যাপারটিকে কেন মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহার কোনও কারণ খুঁজিয়া না পাইয়া রমাপ্রসাদ একটু উদ্বিগ্ন হইতেছিলেন। তিনি ত জানিতেন না—যে মনোরমা অমূল্যচরণের চক্ষু ফুটাইয়া দিয়াছিলেন।

অমূল্যচরণের হাস্যকলরবে, পুরাঙ্গনাগণের মঙ্গলকোলাহলে, বাদ্যের প্রচণ্ড নিনাদে তাঁহার বিস্ময়, পুলক, অধীরতা সমস্ত যেন নিতান্ত দিশাহারার ন্যায় হইয়া উঠিল।

আশার সমাধি।

আমরা সেবার পুরীতে ছিলাম। আমার ভগিনী বহুদিন ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছিলেন, তাঁহার সিন্ধু-তীর-বাসের ব্যবস্থা হইলে, আমাকেই অভিভাবকতার ভার লইতে হইল। আমার ভগিনীপতি ডাকবিভাগের কর্ম্মচারী, তাঁহার পক্ষে ছুটি পাওয়া একরূপ অসম্ভব। আমি তখন বি, এ, পরীক্ষা দিয়া "বেকার" অবস্থায় বসিয়া আছি। কাযেই পরীক্ষার কঠিন পরিশ্রমের পর স্বাস্থ্যভঙ্গের নিকট সম্ভাবনা থাকায় পুরীতে ভগিনীর রক্ষণাবেক্ষণ ও সাহায্যের ভার যখন আমার স্কন্ধে ন্যস্ত হইল, তখন আমি কাহাকেও বুঝাইতে পারিলাম না যে, আমার স্বাস্থ্যভঙ্গের সম্ভাবনা নিতান্তই অল্প; যেহেতু পরীক্ষার জন্য যে সকল ছাত্র দিবারাত্রি পরিশ্রম করে, আমি সেই অল্পবুদ্ধি বালকদিগের দলভুক্ত নহি। পরীক্ষাটা নিতান্ত না দিলে নহে, এই মনে করিয়া, কর্ম্মফলে সম্পূর্ণ অনাসক্ত ভাবেই দিয়াছিলাম; সুতরাং, আমার স্বাস্থ্য পূর্ব্বাপেক্ষাও পরিপুষ্ট হইতেছে, ইত্যাদি নানা যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়া যখন কোনও ফলই হইল না,

তখন কাযেই আমাকে একদিন বাধ্য হইয়া জিনিষপত্র গুছাইয়া পুরী অভিমুখে রওনা হইতে হইল।

পুরীতে গিয়া প্রথম যখন সমুদ্র দর্শন করিলাম, তখন আমার আনন্দের সীমা ছিল না। ঐ শ্রান্তিশূন্য চঞ্চলতা, ঐ নিবিড় বিজনতা, ঐ সীমাহীন বিশালতা আমাকে বিস্মিত, পুলকিত, স্তব্ধ করিয়া রাখিত। আমি সারাদিন সমুদ্রের সৈকতে, বালুরাশির মধ্যে, নহে ত, বারান্দায় আরামকেদারায় বসিয়া সমুদ্রের বিচিত্র লীলা দেখিতাম। অন্ধকারে যখন আকাশের বিশাল কক্ষটি পূর্ণ হইয়া যাইত,—যখন নিকটের বস্তুও দৃষ্টিগোচর হইত না, তখনও আমি অতৃপ্ত নয়নে সিন্ধুর দিকে চাহিয়া থাকিতাম। সন্ধ্যার অন্ধকারে তীরসন্নিহিত ফেনিলোচ্ছল ঊর্ম্মিগুলি দীর্ঘ—অতি দীর্ঘ রজনীগন্ধার মালার মত তটবক্ষে বিলম্বিত হইত। আমার সেই তটবিলগ্ন কুটীর হইতে আমি যেন তাহার সৌরভ পর্য্যন্ত আঘ্রাণ করিতে পাইতাম। চন্দ্রোদয়ের অম্বুরাশি যখন স্ফীত ও চঞ্চল হইয়া উঠিত, তখন আমি পুলকে আত্মহারা হইয়া যাইতাম। চন্দ্রালোকে সমগ্র তটভূমি শুভ্রবাসে আচ্ছাদিত হইত, তমালতালীবনরাজি সেই বসনপ্রান্ত অলঙ্কৃত করিত।

নিশীথের উৎকট নির্জ্জনতার মধ্যে সিন্ধুর সেই দিগন্তপ্লাবী

গর্জ্জনে সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা উঠিত, আর আমি উন্মুক্ত বাতায়নপথে সে দৃশ্য দেখিয়া—সেই গম্ভীর ধ্বনি শুনিয়া মুগ্ধ ও মূক হইয়া রহিতাম। বন্ধু ও স্বজনদিগের মধ্যে আমি উদ্দামপ্রকৃতি বলিয়া পরিচিত ছিলাম। কি নিগূঢ় মন্ত্রের বলে আমার সেই তুচ্ছ উচ্ছৃঙ্খলতা, এই উদ্দাম, বাঁধাহীন, নিরবচ্ছিন্ন উচ্ছৃঙ্খলতার নিকট আত্মোৎসর্গ করিল, তাহা আমি বলিতে পারি না; আমার এই সংযত, শান্ত, শিষ্ট ভাব দেখিয়া ভগিনী আমাকে অনেক সময়ে "কবি," "দার্শনিক" ইত্যাদি আখ্যায় বিব্রত করিয়া তুলিতেন। তাহার একটু কারণও যে না ছিল, এমন নহে। আমি ইহারই মধ্যে প্রায় এক দিস্তা কাগজে কেবল কবিতাই লিখিয়া ফেলিয়াছিলাম। সেগুলি তাঁহাকে অবসর মত পড়িয়া শুনাইতাম। আমার ভগিনী যদিও আমার কবিতার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন না, তাহা হইলেও তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইত, যে কবিতাগুলিতে যথার্থ মৌলিকতা ও ভাবুকতা ছিল।

আমার কবিতার আর একজন সমালোচক হঠাৎ জুটিয়া গেলেন; আমাদের বাড়ীর অনতিদূরে একজন ভদ্রলোক সপরিবারে বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য আসিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহার কন্যা ননীবালা একবার আমার ভগিনীর জ্বর হইলে প্রত্যহ সংবাদ লইতে আসিতেন। সমুদ্রতীরেই

ইহাদের সহিত আমাদের আলাপ হয়। ভদ্রলোকটি আমার ভগিনীপতির অফিসেই কায করিতেন, সম্প্রতি অন্য বিভাগে গিয়াছিলেন। ইহাদের অমায়িকতায় অল্পদিনের মধ্যেই আমরা মুগ্ধ হইলাম; আমার ভগিনীর অসুখের সময় সূর্য্যকান্ত বাবু ও তাঁহার পত্নী নিতান্ত আত্মীয়ের মত আমাদের তত্ত্বাবধারণের সমস্ত ভারই গ্রহণ করিয়াছিলেন। সূর্য্যকান্ত বাবুর অষ্টাদশ বর্ষীয়া অবিবাহিতা কন্যা ননী আমার ভগিনীকে "দিদি" বলিয়া ডাকিতেন, এবং আমার সম্মুখে আসিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেন না। একদিন আমার ভগিনীর সহযোগিতায়, তাঁহার নিকট আমার কবিত্ব ধরা পড়িয়া গেল। আমি মধ্যাহ্নে বারান্দায় বসিয়া একাগ্রচিত্তে সমুদ্রের বর্ণবৈচিত্র্য দর্শন করিতেছি ও সেই অনির্ব্বচনীয় বিশালতাকে ভাষা ও ছন্দের ক্ষুদ্র গ্রন্থিতে বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছি, এমন সময়ে আমার ভগিনী ও ননী আসিয়া সহসা আমার চিন্তাসূত্রকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া দিলেন। আমি আত্ম-গোপন করিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু ব্যর্থ চেষ্টা। ভাগিনী হাসিয়া উঠিলেন। আমি অপ্রতিভ হইলাম, ননীর চক্ষু কিন্তু আমার কবিতার দিকে; কৌতূহলের দীপ্তি সে কমনীয় মুখখানিকে আরও সুন্দর করিয়া তুলিয়াছিল। আমার দুই একটি কবিতা পাঠ করিবার জন্য যখন আমি আহূত হইলাম, তখন বাস্তবিকই আমার সর্ব্বশরীর ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল।

আমার স্বাভাবিক সপ্রতিভ ভাব কোথায় চলিয়া গেল! আমি নিতান্তই অনিচ্ছা জানাইলাম।

আমার ভগিনী বলিলেন, "তবে থাক্। একটা কিছু ভাল লেখা হইলে মোহিন্ আমাদের পড়িয়া শুনাইবে, এই সর্ত্তে আজ আমরা মোহিন্‌কে মাপ করিতে রাজি আছি। কি বল, ননী?"

উত্তরের জন্য আমি ননীর দিকে উৎসুকভাবে চাহিলাম। যাহারা কাব্য ও কবিতা লিখে, এবং যাহারা গান গাহিতে জানে তাহারা প্রথম আহ্বানে যুগপৎ ইচ্ছা এবং অনিচ্ছার দোলায় দুলিতে থাকে। ইচ্ছা-কবিতা পড়িয়া বা গান গাহিয়া শুনায়; কোনরূপে আত্ম-পরিচয় দেয়; কিন্তু লজ্জা, সঙ্কোচ সে ইচ্ছাকে কুণ্ঠিত করিয়া তুলে। তখন শ্রোতার পক্ষে একটু আগ্রহ ও সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ বড়ই মিষ্ট লাগে।

ভগিনীর এই উপেক্ষাব্যঞ্জক উক্তিতে আমি মৌখিক সাগ্রহ সম্মতি জানাইলেও মনে মনে সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছিলাম না। তাঁহার সঙ্গিনী কিন্তু পূর্ব্বেরই ন্যায় আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, আমি তাঁহাকে বিমুখ করিতে পারিলাম না। প্রথমে আমার 'সিন্ধূল্লাস' নামক কবিতাটি পাঠ করিয়া তাঁহাকে শুনাইলাম। তাহার পর 'জলধি-গীত,' 'জলকল্লোল' প্রভৃতি এক এক করিয়া তাঁহাদিগকে শুনাইতে লাগিলাম। নির্ঝরের ধারার ন্যায় আমার কবিতার

উৎস কি এক রহস্যের প্রভাবে স্বতঃই উৎসারিত হইতে লাগিল! আমার শ্রোতাদিগের প্রশংসোজ্জ্বল নেত্রে আমার কবিতার চরিতার্থতা দেখিতে পাইলাম। আমি এতই তন্ময় হইয়া গিয়াছিলাম যে, মধ্যাহ্নের কড়ি মধ্যম কখন অপরাহ্নের নিখাদে গিয়া মিশিল, তাহা আমার আদৌ খেয়াল ছিল না। আমার ভগিনী বলিয়া উঠিলেন, "ভাল, ননী, আজ বুঝি আর বেড়াইতে যাইতে হইবে না? সব কবিদের পাল্লায় পড়িয়া অরসিকার নিরুপায় দেখ্‌ছি।" তাঁহার সঙ্গিনী ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পড়িলেন। আমি আমার "দপ্তর" বাঁধিতে মনোযোগী হইলাম। ননী যাইবার সময় আমার ভগিনীকে বলিলেন, "মোহিনী বাবু ত সুন্দর কবিতা লিখেন; ইনি কালে একজন বিখ্যাত কবি হইবেন, সন্দেহ নাই।" আমার ভগিনী একটু হাসিলেন। বলা বাহুল্য, আমি গলিয়া গেলাম। সেই হইতে ননী আমার কবিতার নিয়মিত সমালোচক হইলেন। আমি আমার সমস্ত কবিতাগুলিই তাঁহাকে শুনাইতাম, তিনিও নিঃসঙ্কোচে ও মুক্তকণ্ঠে সেগুলির প্রশংসা করিতেন। তাঁহার প্রশংসায় আমি উৎফুল্ল হইতাম, এবং প্রতিভার অবশ্য-প্রাপ্য—শ্রদ্ধা, পূর্ণমাত্রায় আদায় করিয়া লইবার জন্য ব্যগ্র হইতাম।

সূর্য্যকান্ত বাবুর পরিবারের সহিত, আমাদের পরিবারের সম্বন্ধ ক্রমশঃ ঘনীভূত হইতে লাগিল। সূর্য্যকান্ত বাবু ব্রাহ্ম; তিনি অতি

অমায়িক ও সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার সৌম্য, সুন্দর, বলিষ্ঠ মূর্ত্তিতে সখ্য ও সহানুভূতি সপ্রকাশ ছিল। তাঁহার হাসিতে বালকোচিত সরল প্রফুল্লতা ফুটিয়া উঠিত। আমি যেমন তাঁহার ব্যবহারে তৃপ্ত হইয়াছিলাম, তিনিও আমার প্রতি সেইরূপ তুষ্ট ছিলেন। একবার সপ্তাহান্ত-ভ্রমণে আমার ভগিনীপতি পুরীতে আসিলে সূর্য্যকান্ত বাবু তাঁহার নিকট শতমুখে আমার প্রশংসা করিয়াছিলেন। আমি আমার কাব্যকলা ছাড়িয়া, অনেক সময় তাঁহাদের প্রতি আমার কর্ত্তব্য করিয়া উঠিতে পারিতাম না। কিন্তু তাঁহারা অক্লান্তভাবে আমাদের স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের জন্য চেষ্টা করিতেন।

এইরূপ ভাবে অনতিদীর্ঘকালমধ্যে আমাদের প্রীতিবন্ধন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতে চলিল। যখন সমুদ্র তীরে বেড়াইতে যাইতাম, তখন আমি আর ননী হয়ত সূর্য্যাস্তের সৌন্দর্য্য, গোধূলিতে রক্ত মেঘের নিম্নে শান্ত সমুদ্রের সৌন্দর্য্য, বিরল-নক্ষত্র বিশাল গগনের সৌন্দর্য্য—এই সকল লইয়া আলোচনা করিতাম। আমি উপদেষ্টার ন্যায় আমার মতগুলি ব্যক্ত করিতাম, ননী শিষ্যার ন্যায় সে সকল শুনিয়া যাইতেন। তাঁহার কবিত্বময়ী কল্পনাকে আমি অভ্রশ্রেণীর স্তর দিয়া, লহরীর সোপান দিয়া, চন্দ্র-কিরণের উপর দিয়া, অস্তস্ত-তোরণ-মালারূপ বলাকাশ্রেণীর সুঠাম গতির মধ্য দিয়া ছুটাইয়া দিতাম, এবং আপনার শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি

করিয়া মনে মনে গর্ব্ব অনুভব করিতাম। ব্রাহ্ম পরিবারে লালিতা, সূর্য্যকান্ত বাবুর ন্যায় পিতার আদর্শে ও সংসর্গে বর্দ্ধিতা ননীবালা যে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিতা ছিলেন, তাহা আমার বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। সেই জন্যই তাঁহার ন্যায় ভক্ত সঙ্গিনী ও সমালোচক প্রাপ্ত হইয়া আমার গর্ব্ব সর্ব্বতোভাবে চরিতার্থ হইতেছিল। অপরাহ্নটা অনেক সময়ে আমরা এক সঙ্গে কাটাইতাম। কোন কোন দিন সমুদ্রবক্ষে মেঘের লীলা দেখিবার জন্য আমরা সমুদ্রকূলে বসিয়া থাকিতাম, এবং ছোট ছোট ছেলে মেয়ে ও আমার ভগিনীকে লইয়া সূর্য্যকান্ত বাবু, আমাদিগকে সত্বর আসিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া, গৃহে ফিরিতেন। আমরা মেঘান্ধকারে শ্যামায়মান গোধূলিতে নির্জ্জন সৈকতে বসিয়া থাকিতাম। এবং ক্যাক্‌টাস্-বেষ্টিত রাজপথ বাহিয়া বিদ্যুচ্চমকিত সন্ধ্যায় গৃহে ফিরিতাম।

আমি প্রত্যূষে সমুদ্রস্নান করিতে যাইতাম। বহুক্ষণ জলে থাকিয়াও আমার স্নানের পিপাসার নিবৃত্তি হইত না। এই যে দিগন্তপ্রসারিত লবণাম্বুরাশি, যাহা বিপুল রাহুর ন্যায় কৃষ্ণকবলে শস্যশ্যামলা পৃথিবীকে ত্রিপাদ গ্রাস করিয়া পাদমাত্র অবশিষ্ট রাখিয়াও শান্তি লাভ করে নাই, তাহাকে শরীরের অতি নিকটে পাইয়া আমি বড়ই প্রীতি লাভ করিতাম। যখন ঢেউ এর পর ঢেউ আসিয়া আমাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত, তখন আমি

দক্ষিণমেরু পর্য্যন্ত বিশ্রান্ত এক সচেতন, প্রবুদ্ধ সত্তার স্পর্শ অনুভব করিতাম। যে দিন সমুদ্রস্নান করিতে না পাইতাম, সেদিন যেন আমার আর স্ফূর্ত্তি বোধ হইত না।

সূর্য্যকান্ত বাবু যখন শুনিলেন যে, আমি একজন নিত্যস্নায়ী, তখন তিনিও নিত্য আসিতে লাগিলেন। তাঁহার সঙ্গে ননী ও তাঁহার মাতা আসিতেন। শেষে সব দিন হয়ত সূর্য্যকান্ত বাবুর এবং তাঁহার স্ত্রীর আসা ঘটিয়া উঠিত না; কেবল ননী আমার ভগিনীর সঙ্গে স্নানার্থ আসিতেন। আমিও তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতাম।

সকালে বৈকালে এইরূপ প্রতীক্ষা করিয়া করিয়া প্রতীক্ষা করাটাই আমার অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু একদিন বুঝিতে পারিলাম যে, এ প্রতীক্ষা অভ্যাসের ফলমাত্র নহে—ইহার মধ্যে এমন একটা কিছু আছে, যাহা একবার ছাড়িয়া দিলে মুহূর্ত্তমধ্যে সমস্ত হৃদয় প্লাবিত করিয়া ফেলিবে। প্রথমে আমি আপনার কাছে ধরা দিতে চাহি নাই, নানারূপ কারণ খুঁজিয়া আমার এই ভিখারীপনা উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিলাম; সাহিত্যামোদ, পুরীর নির্জ্জনতা, উভয়ের মতের প্রতি পরস্পরের সহানুভূতি ইত্যাদির আশ্রয় লইয়া যথার্থ কারণটাকে চাপিয়া রাখিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু একবার যখন ননী অসুস্থ হইয়া বাড়ীর বাহিরে আসিতে নিষিদ্ধ হইলেন, তখনই আমি বুঝিতে পারিলাম যে, আমার

অজ্ঞাতসারে আমার হৃদয় আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে। রমণীর রূপলাবণ্য আমার চিত্তে রেখাঙ্কিত করিতে পারিত না। আমি একটু আধটু সাহিত্যচর্চ্চা করিলেও এ পর্য্যন্ত কখনও সৌন্দর্য্যচর্চ্চা করি নাই। কাযেই প্রথম যখন আমি আপনার কাছে ধরা পড়িলাম, তখন মনে যে ভাব হইয়াছিল, তাহার সহিত আনন্দের সম্পর্কমাত্র ছিল না। আমি ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইলাম। কেমন করিয়া আমি আত্মবিক্রয় করিলাম, কোন্ মুহূর্ত্তে বিশুদ্ধ কাব্যচর্চ্চা প্রেমের পূর্ব্বরাগে পরিণত হইল, কোন্ দুষ্ট দেবতা আমার এই দুর্ব্বল হৃদয় হইয়া এমন তীব্র পরিহাস আরম্ভ করিলেন, তাহাই ভাবিতে ভাবিতে আমি অস্থির হইয়া উঠিলাম। কোথায় গেল আমার কাব্যকলা, কোথায় গেল আমার নূতন নূতন সৌন্দর্য্যসৃষ্টি! কোথায় একজন বিখ্যাত কবি হইবার আয়োজন করিব—না, কোথায় বিরহের তাড়নায় 'পতঙ্গবৎ বহ্নিমুখং বিবিক্ষুঃ' হইয়া সকল আশার অবসান করিতে বসিলাম! ইংরেজিতে একটা কথা আছে যে, গম্ভীর এবং হাস্যাস্পদের মধ্যে পাদৈকমাত্র ব্যবধান। আমার ভাগ্যে তাহাই ঘটিল।

যাহা হউক, ননীর রূপলাবণ্য সম্বন্ধে আর আমি উদাসীন থাকিতে পারিলাম না। তাঁহার সুবিন্যস্ত কৃষ্ণকেশপাশ হইতে চঞ্চল চরণক্ষেপভঙ্গী পর্য্যন্ত সমস্তই আমার নয়নে অতুলনীয় সুন্দর বোধ হইতে লাগিল। প্রেমাস্পদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্রুটিগুলি পর্য্যন্ত

চিত্ত আকর্ষণ করে। আমিও সম্পূর্ণরূপে আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। যদি মুহূর্ত্তের জন্যও সে আকর্ষণের একটি ক্ষুদ্র প্রতিবিম্ব তাঁহার নয়নে বা ভঙ্গিতে দেখিতে পাইতাম, তাহা হইলে আমার জীবনের সমস্ত সাধনার সফলতা লাভ হইত। কিন্তু কখনও সে ভাবটি দেখিতে পাই নাই। ননীর কথাবার্ত্তায়, পরিহাসকৌতুকে এমন কিছুই কখনও প্রকাশ পায় নাই, যাহার প্রান্তে আমার আশার অতি দীন ঝুলিটি বাঁধিয়া দিতে পারি। সুতরাং আমি বুঝিলাম, নিষ্ফল প্রেমের তুষানল বিধাতা আমার জন্য ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমি ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিলাম।

ইহার পর যত বার ননীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে, আর পূর্ব্বের মত নিঃসঙ্কোচে কথা কহিতে পারি নাই। যেন বাধ বাধ ঠেকিত। কিন্তু তাঁহার আকর্ষণ আরও প্রবল ভাবে অনুভব করিতাম। ননী বা সূর্য্যকান্ত বাবু, কেহই আমার হৃদয়ের এই ভাবপরিবর্ত্তন জানিতে পারেন নাই। কিন্তু আমার দিদির নিকট আমি সম্পূর্ণ আত্ম-গোপন করিতে সমর্থ হই নাই। সময়ে সময়ে আমার মনে হইত, যেন তিনি আমার অন্তরের কথা জানিতে পারিয়াছেন। আমি যথাসাধ্য তাঁহার দৃষ্টি এড়াইয়া চলিতে চেষ্টা করিতাম; মধ্যে মধ্যে অপরাহ্ণে কাহাকেও কিছু না বলিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িতাম। ননী আসিতেন, আমার সন্ধান করিতেন এবং আমি তাঁহাদের ফেলিয়া বেড়াইতে গিয়াছি বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেন।

কিন্তু আমার এ কঠোর আত্মনিগ্রহের চেষ্টা ব্যর্থ হইল; আমি নিতান্ত নিরুপায় হইয়া ঘটনাস্রোতে গা ঢালিয়া দিলাম। যখন কোনও স্নিগ্ধ সন্ধ্যায় সমুদ্র-সৈকতে বালুরাশির মধ্যে আসন রচনা করিয়া আমরা প্রকৃতির রহস্যালোচনায় ব্যাপৃত থাকিতাম। ক্রীড়াপরায়ণ বালক বালিকারা যখন ঊর্ম্মির সঙ্গে ছুটাছুটি করিয়া হাস্যকোলাহলে সমুদ্রতীর মুখর করিয়া তুলিত, সূর্য্যকান্ত বাবু যখন ভ্রমণক্লান্ত প্রৌঢ় ও বৃদ্ধদিগের সহিত আলাপে রত হইতেন, আর জলধিস্নাতসমীর-হিল্লোলে যখন শরীর সিক্ত ও রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিত, তখন আমি হর্ষবিহ্বলনেত্রে ননীর মুখপানে চাহিয়া থাকিতাম। ননীর কবি-হৃদয় স্বভাবের শোভায় নিমজ্জিত হইয়া থাকিত; আমার নীরব, কাতর নিবেদন তাহার মর্ম্মে প্রবেশ-লাভ করিত না। আমি মর্ম্মে মর্ম্মে ব্যথিত হইতাম।

কিন্তু এত দিনে অল্পে অল্পে যে প্রভুত্ব আমি গড়িয়া তুলিয়াছিলাম, সে প্রভুত্বের নেশায় আমাকে অনেক সময়ে বিভোর করিয়া রাখিত। যে স্থানে মানসিক শ্রেষ্ঠতা অনুভব করিবার সুযোগ আছে, তথায় সে সুযোগ পরিত্যাগ করা বড় সহজ নহে; বিশেষ, প্রেমাস্পদের নিকট আপনাকে যত বড় করিয়া দেখান যাইতে পারে, ততই আত্মপ্রসাদ লাভ করা যায়। অন্য স্থলে যাহাই হউক, তথায় আপনাকে বাড়াইবার ইচ্ছা এত বলবতী হয় যে, সে প্রলোভন সহজে অতিক্রম করা যায় না। আমারও

তাহাই হইল। শুধু বিশুদ্ধ সাহিত্য-সম্বন্ধে নহে, জগতের যাবতীয় তত্ত্ব লইয়া আমি আলোচনা করিতাম ও আপনার মত অসঙ্কুচিত-চিত্তে প্রকাশ করিতাম। ননী যেরূপ অবহিত ভাবে শুনিয়া যাইতেন, তাহাতে আমার উৎসাহ শতগুণ বর্দ্ধিত হইত। আমি পুস্তকে যে সকল তত্ত্ব পাঠ করিয়াছিলাম, সেই সকলকে নূতনত্বের আবরণ দিয়া অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে বিবৃত করিতাম, এবং আমি যে একজন অসাধারণ পণ্ডিত ননীর মনে এমনই একটা ধারণা জন্মাইয়া দিতে চেষ্টা করিতাম। এক দিন সঙ্গীতের সম্বন্ধে কথা পাড়িলাম; কয়েকটি সঙ্গীতের অংশ অনর্গল আবৃত্তি করিয়া ফেলিলাম, এবং গাহিয়া শুনাইতে না পারিলে তাহার সৌন্দর্য্য বুঝাইয়া দেওয়া অসম্ভব, এইরূপ আভাস দিয়া জানাইলাম যে, সঙ্গীতেও আমার বিলক্ষণ অধিকার আছে। ছাত্রমণ্ডলে আমাকে কখন কখন গান করিতে হইত, সুতরাং সঙ্গীতের সহিত আমার পরিচয় ছিল। এখন আমার ইচ্ছা হইল যে, ভগবান যখন আমাকে সু-কণ্ঠ দিয়াছেন, তখন ননীকে একবার গান শুনাইব না? "প্রিয়েষু সৌভাগ্যফলা হি চারুতা" যাহাকে ভালবাসি, তাহাকে যদি মুগ্ধ না করিতে পারিলাম, তবে গুণ থাকিয়া লাভ কি?

সেই দিনই অপরাহ্নে যখন ননীদের পঁহুছিয়া দিয়া বাড়ীতে ফিরিব, তখন ননী সূর্য্যকান্ত বাবুকে বলিলেন, "বাবা, মোহিনী

বাবু ভাল গাহিতে পারেন, তাহা জান না ?” আমি মস্তক অবনত করিলাম। সূর্য্যকান্ত বাবু হাসিয়া বলিলেন, “বটে ! তা, এতদিন মোহিনী আমাকে বঞ্চিত করিয়াছে কেন ? আমি ভাবি, মোহিনী কাব্য আর দর্শন লইয়াই থাকে।” তাঁহার হাস্যে গৃহপ্রাঙ্গণ ভরিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, “বেশ ত, আজই হউক না ?” আমি প্রথমে একটু আপত্তি জানাইলাম। একটা টেব্‌ল্ হারমোনিয়ম্ গৃহাভ্যন্তর হইতে বারান্দায় আনীত হইল। আমি সূর্য্যকান্ত বাবুর মুখের দিকে চাহিলাম, তিনি বলিলেন, “ও সব আমার আসে না, ছেলে মেয়েরা বাজায় আমি শুনি এই পর্য্যন্ত।” আমি একটু বিব্রত হইলাম। বাদ্যটা আমার তত অভ্যস্ত ছিল না। তবুও আমি একটু চেষ্টা করিলাম ; সুবিধা হইল না। সূর্য্যকান্ত বাবু বলিলেন, “তুমি এস ; ননী, যাও ত, মা।” আমার ত চক্ষু স্থির ! আমি যতক্ষণ সপ্রতিভ ভাব ধারণ করিতে চেষ্টা করিতেছিলাম, ততক্ষণে ননীর চম্পকাঙ্গুলি অবলীলাক্রমে পর্দ্দার মধ্যে সঞ্চালিত হইতেছিল। আমি আমার যথাশক্তি গান করিতে লাগিলাম ; যদি গানের দ্বারা আমার ক্ষুণ্ণ গৌরবকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারি, সেই চেষ্টা করিলাম। কিন্তু কণ্ঠ কাঁপিয়া গেল, স্থানে স্থানে স্বরভঙ্গ লইল। আমার উৎসাহ নির্ব্বাপিত হইল।

সূর্য্যকান্ত বাবু ননীকে গান গাহিতে অনুরোধ করিয়া বসিলেন। আমি দেখিলাম, আমার আসন টলিয়া উঠিয়াছে

—আমি যে উচ্চ আসন গ্রহণ করিয়া ননীর নিকট কিছু পূর্ব্বে আমার গৌরব প্রচার করিতেছিলাম, বাধ্য হইয়া সে আসন আমাকে পরিত্যাগ করিতে হইল। ননী অসুস্থতার দোহাই দিয়া আসন হইতে একেবারে উঠিয়া পড়িলেন। কেন জানি না, আমি তাহাতে একটু প্রীতি অনুভব করিলাম। কিছুক্ষণ পরে আমি গৃহে ফিরিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলাম। সে দিন আর আমার মনের অন্ধকার ঘুচিল না।

এই ঘটনার পর অনেক দিন আমাদের সাক্ষাৎ হইয়াছে, কিন্তু সঙ্গীতের কথা এক দিনও উঠে নাই। আমার ভগিনী আমাকে একদিন বলিয়াছিলেন যে, ননী আমার গানের প্রশংসা করিয়াছে। আমি ভাবিলাম, “পরিহাস নহে ত?” পরবর্ত্তী ঘটনায় সে ধারণা আরও বর্দ্ধিত হইল। একদিন ‘মলয়া’ নামক একখানি মাসিক পত্র আমার দিদির নামে আসিল। এখানি মহিলা-পরিচালিত উচ্চ শ্রেণীর মাসিক পত্র। আমার দুই একটি কবিতা ইহাতে ছাপিবার জন্য পাঠাইয়াছিলাম; মুদ্রিত হয় নাই। ননী এ সংবাদ রাখিতেন। তিনি সম্পাদিকার নির্ব্বাচনী শক্তিকে এ জন্য এক দিন নিন্দাও করিয়াছিলেন। ‘মলয়া’ যে সময় হস্তগত হইল, ননী তখন আমাদের বাড়ীতে ছিলেন। আমরা সর্ব্বাগ্রে কবিতা পাঠ করিলাম। তাহার মধ্যে একটি কবিতা আমি একাধিক বার পাঠক রিলাম এবং রচয়িত্রীর প্রশংসা করিলাম। এ

সম্বন্ধে ননী আমার সহিত একমত হইতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন যে, কবিতাটি সর্ব্বাংশেই নিষ্ফল হইয়াছে। আমাদের এইরূপ মতভেদ বড় হইত না। কাযেই আমি আরও দৃঢ়তার সহিত সেই কবিতার প্রশংসা করিয়া আমার প্রাধান্য অটুট রাখিতে সচেষ্ট হইলাম।

আমার দিদি যখন আমাকে আসিয়া বলিলেন যে কবিতাটি ননীর লেখা, তখন আমি বিস্ময়ে, দুঃখে, লজ্জায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম। শ্রীমতী প্রীতিবালা রায় নূতন কবিদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা যশস্বিনী হইয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সেই প্রীতিবালাই কি ননী? ননী পূর্ব্বেই বিদায় লইয়াছিলেন। সুতরাং আমি আমার মনোভাব সহজেই গোপন করিতে পারিলাম। আমার অন্তঃকরণে তখন যে কি বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা দিদি জানিতে পারেন নাই। তিনি গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃতা হইলেন; যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, "কি আশ্চর্য্য, তুমি এত দিন জানিতে না যে, ননী একজন সু-কবি।" আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই ছিল না। ননী কাব্যানুরাগিণী, তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম। কিন্তু স্ত্রীজাতি স্বভাব-কবি। আমাদের মত চেষ্টা করিয়া, মিল জুটাইয়া ত তাহাদিগকে কবি সাজিতে হয় না।

যতই চিন্তা করিতে লাগিলাম ততই মনে মনে লজ্জিত হইতে লাগিলাম। কি আশ্চর্য্য, এত দিন কিছুই জানিতে পারি নাই!

আমার কত কি ছাই ভস্ম কবিতা ননীকে পড়িয়া শুনাইয়াছি! আর তাঁহার যে প্রশংসা শুনিয়া আমি আনন্দে কণ্টকিত হইয়া উঠিতাম, তাহা উপহাস! মনে মনে ননীর উপর ক্রুদ্ধ হইলাম। ননীর চরিত্রে স্বাভাবিক মাধুর্য্যের সঙ্গে যে কাব্য-সৌন্দর্য্য ও সঙ্গীত-কলা মিশিয়া অপূর্ব্ব ত্রিবেণী-সঙ্গমের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা চিন্তা করিয়া আনন্দ অনুভব করিবার মত প্রবৃত্তি তখন আর আমার ছিল না। চিরদিনের মত কবিতাকে বিদায় দিলাম। না হাঁটিলে ক্ষুধা হয় না, শরীর পালনের এই নিয়মের দোহাই দিয়া মহিলাদিগের সংসর্গ ত্যাগ করিলাম। ননীও আর পূর্ব্বের মত সর্ব্বদা আমাদের বাড়ীতে আসিতেন না; দিদি বিদ্রূপ করিয়া বলিতেন, আমার "কবিতার নদীতে ভাঁটা পড়িয়া যাওয়ায়, ননীকে আর দেখিতে পাওয়া যায় না" কারণটা তিনি ঠিক অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন কি না, বুঝা যায় নাই।

আমার গর্ব্বের এক একটি স্তম্ভ এইরূপ নির্ম্মম ভাবে ভগ্ন হইতে লাগিল; তাহাতে আমি অত্যন্ত অপ্রতিভ ও ক্ষুব্ধ হইয়াছিলাম, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের কারণ এই যে, হৃদয় যাহার নিকট এমন সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, তাহার নিকট অভিমান এইরূপ লাঞ্ছিত ও দলিত হইলে দুঃখের

আর সীমা থাকে না। আমি এই নিষ্ফল দুঃখের জ্বালা হৃদয়ে বহিয়া বহিয়া কাতর হইয়া পড়িতেছিলাম। সমুদ্রের অনাবৃত, সীমাহীন, উদারতা সে জ্বালা প্রশমিত করিতে পারিল না।

এইরূপ অশান্ত হৃদয়ে কিছু দিন বেড়াইলাম, তাহার পর আবার যখন আমার পক্ষে ননীর আকর্ষণ প্রবল হইয়া আসিতে-ছিল, ঠিক সেই সময়ে যে ঘটনাটি ঘটিল তাহার স্রোতে আমার গৌরবের শেষ চিহ্নটুকু পর্য্যন্ত ভাসাইয়া লইয়া গেল।

একদিন আমি ও আমার দিদি সূর্য্যকান্ত বাবুর বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। তাঁহার আরও কয়জন বন্ধুও আহারের জন্ম নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। বৃদ্ধদিগের উচ্চ হাস্যে ও শিশুদিগের কলরবে গৃহ আমোদিত হইয়াছে। উৎসবের কারণ শুনিলাম যে, ননী বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সংবাদ কলিকাতা হইতে আজ আসিয়াছে। কি সর্ব্বনাশ! মধ্যাহ্নে আমিও একখানি চিঠি পাইয়াছিলাম। তাহাতে আমি পাশ না হওয়ায় আমার ভগিনীপতি দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। আমি তাহাতে দুঃখিত হই নাই, কারণ, আমার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার কোন সম্ভাবনাই ছিল না।

ননীর সাফল্য সংবাদে আমি ক্ষোভে, ক্রোধে, লজ্জায় যেন একেবারে জ্ঞানশূন্য হইয়া গেলাম। কি বিড়ম্বনা, ইহারই নিকট উপদেষ্টার আসন গ্রহণ করিয়া, এত দিন বিদ্যার জন্য বাহাদুরী

লইতে চেষ্টা করিয়াছি! ইহা ভাবিতে ভাবিতে আমি ঘর্ম্মাপ্লুত হইয়া উঠিলাম; এবং সন্ধ্যার অন্ধকারে সে স্থান পরিত্যাগ করিলাম। সূর্য্যকান্ত বাবুকে সংক্ষেপে শারীরিক অসুস্থতা জানাইয়া বিদায় লইলাম। ননীর সহিত সে দিন দেখা হয় নাই।

বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া বারান্দায় শুইয়া পড়িলাম। যে মুক্ত বায়ু নিদাঘ মধ্যাহ্নের উত্তাপকেও শীতলতায় পরিণত করিত, আজ তাহা আমার গাত্রজ্বালা দূর করিতে পারিল না। আহত ফণী যেমন আপনাকে আপনি দংশন করিয়া জর্জ্জরিত হয়, অভিমানাহত আমি তেমনই আপনার বিষে আপনি দগ্ধ হইতে-ছিলাম, এই অনলদাহে প্রেমই অধিক ইন্ধন সংগ্রহ করিয়া দিল। বুঝিলাম, স্বয়ং ইচ্ছা করিয়া এমন এক ক্ষুধিত রাক্ষসকে জাগাইয়া তুলিয়াছি যে, সমস্ত জীবনটি তাহার নির্ম্মম কবলে অল্পে অল্পে নিষ্পেষিত হইবেই হইবে। তারকাখচিত বিশাল গগনের দিকে চাহিলাম, শুভ্রফেনসজ্জিত তরঙ্গরাশির দিকে চাহিয়া রহিলাম। কিছুতেই শান্তি দিতে পারিল না। আমার ভগিনী যখন গৃহে ফিরিলেন, তখন আমি নিদ্রার ভাণ করিয়া রহিলাম।

ননীর সঙ্গ একেবারেই বর্জ্জন করিলাম। ননীও আর আমার সহিত আলাপ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেন না। সম্ভবতঃ আমার মনোভাব তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। দেখা হইলে, কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াই আমরা অন্য কাজে চলিয়া

যাইতাম। এমনই ভাবে অভিমানের অনলে কাব্য, সঙ্গীত, প্রেম—সব পুড়িয়া ভস্মীভূত হইতে লাগিল।

স্নানের সময়—যে দিন ননীর সহিত দেখা হইত, সে দিন আমার আর ভাল স্নান হইত না। কিন্তু ননী আর পূর্ব্বের মত স্নান করিতে যাইতেন না। কিছু দিন তাহাতে শান্তি অনুভব করিলাম। কিন্তু আবার প্রাণে আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল। আবার তাঁহার দর্শনের জন্য মন ব্যাকুল হইতে লাগিল; মানুষের অসীম দুর্ব্বলতা সমস্ত সঙ্কল্পকে পরাভূত করিল। মনে হইত, এত রূপ, এত গুণ,—দর্শনে কি দোষ? সমুদ্রতরঙ্গের মধ্যে যে বাধাহীন, ভাষাহীন, অনাবিল মিলন,—তাহাকে বহুদিন হইতে কামনার বস্তু বলিয়া মনে করিয়া আসিয়াছি, কাজেই আমার সে অতৃপ্ত কামনা শান্ত হইত না।

সেইরূপ অবাধ মিলন একদিন আমার ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। সেদিন সিন্ধু চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। অধীর তরঙ্গগুলি তটভূমিকে বিধ্বস্ত, ব্যথিত, প্লাবিত করিয়া ফেলিল। অনেক স্নানার্থী সমুদ্রের অবস্থা দেখিয়া স্নানে বিরত হইলেন। ভ্রমণরত জনগণ তীর হইতে সমুদ্রের ভীষণভাব দেখিতে লাগিলেন। গর্জ্জনও সেদিন অন্যান্য দিন অপেক্ষা গভীর। মধ্যে মধ্যে কামানের নিনাদের ন্যায় শব্দ হইতেছিল। উর্ম্মিতে সেদিন দূর সমুদ্র দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না। কেবল যে ভঙ্গপ্রবণ তরঙ্গগুলি প্রবল

ছিল, তাহা নহে, স্রোতেরও এমন ভয়ানক টান ছিল যে, স্নানের সময় আত্মরক্ষা করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আমি স্নান করিতে করিতে চাহিয়া দেখি, আমার ভগিনী ও ননী হাত ধরাধরি করিয়া নামিতেছেন। কিছুক্ষণ পরেই দেখিলাম, তাঁহারা গভীর জলে গিয়া পড়িতেছেন, এবং সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও তরঙ্গের ও টানের বিরুদ্ধে কূলের দিকে আসিতে পারিতেছেন না। মুহূর্ত্ত মধ্যে আমি সমস্ত অবস্থাটা বুঝিতে পারিলাম, এবং প্রাণপণে তরঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগের সাহায্যার্থ যাইতে লাগিলাম। তীর হইতে আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল। স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের নিকটে যাইতে অধিক সময় লাগিল না। ততক্ষণে ননী ডুবিয়া গিয়াছেন, আমার ভগিনী তখনও ভাসিয়া ও ডুবিয়া তীরের দিকে আসিতেছেন। আমি নিকটে যাইতেই তিনি হাত বাড়াইয়া দিলেন, আমি অগ্রে ডুব দিয়া প্রবল চেষ্টায় ননীকে জলের উপর তুলিলাম। আমার দিদিও আমাকে বেষ্টন করিয়া ধরিলেন। স্রোতের প্রতিকূল দিকে যাইতে এইবার আমার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিতে হইল। আমি উন্মত্তের মত সমুদ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলাম। আমার দিদিকে চাপিয়া ধরিতে নিষেধ করিলাম। কিন্তু তিনি ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তিনি আরও দৃঢ়ভাবে আমার গলদেশ বেষ্টন করিলেন। ননীর দেহে স্পন্দন ছিল না।

কতক্ষণ এইরূপ সংগ্রাম করিয়াছিলাম, তাহা আমার মনে নাই, কিন্তু সেই কয় মুহূর্ত্ত আমার পক্ষে যুগের মত বোধ হইতে লাগিল। কতকটা দূর আসিবার পর আমার প্রাণান্ত চেষ্টাও ব্যর্থ হইতে লাগিল। তরঙ্গের সহিত সংগ্রামে আমার হস্তপদ অবসন্ন হইয়া আসিয়াছিল। কূলের নিকটে আসিয়া আমার সংজ্ঞা লুপ্ত হইতে লাগিল। তার পর কি হইয়াছিল, তাহা আমি আর ভাল জানি না। তীর হইতে কয়েকজন নামিয়া আমার শিথিল হস্ত হইতে ননীকে ও আমার দিদিকে টানিয়া তুলিলেন, কিন্তু আমাকে ধরিবার পূর্ব্বেই স্রোতে আমাকে অগাধ জলে ভাসাইয়া লইয়া গেল। পরে শুনিয়াছি, ঠিক সেই সময়ে নুলিয়াদের একখানি মাছ ধরিবার নৌকা ফিরিতেছিল, তাহারাই আমাকে সেই আসন্ন সলিল-সমাধি হইতে তুলিয়া লইয়া আইসে।

আমার যখন জ্ঞান হইল, তখন প্রভাতের আলোক ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছিল। দিদি ও ননী আমার শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। আমি চক্ষুরুন্মীলন করিবামাত্রই দিদি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। ননীও অঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন। সূর্য্যকান্ত বাবু আসিয়া সস্নেহে আমার মস্তকে হস্ত বুলাইয়া দিলেন।

আমার সুস্থ হইতে এক পক্ষকাল অতীত হইয়া গেল। আমার অচৈতন্যাবস্থায় সূর্য্যকান্ত বাবু ও তাঁহার কন্যা আমাদের বাড়ীতেই

ছিলেন। আহারনিদ্রা ত্যাগ করিয়া তাঁহারা আমার শুশ্রূষায় তৎপর হইয়াছিলেন। একটু সুস্থ হইয়াই তাঁহাদিগকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাইবার অবসর খুঁজিতে লাগিলাম। কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই সূর্য্যকান্ত বাবু অশ্রুপূর্ণলোচনে, তাঁহার কন্যার জীবনরক্ষার জন্য আমাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিলেন। তাঁহার সে আবেগপূর্ণ শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা দেখিয়া বাস্তবিক মনে হইল, আমার ক্ষুণ্ন গৌরব সত্য সত্যই পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে।

একদিন জ্যোৎস্না-পুলকিত সন্ধ্যায়, ননী আমার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া মোজা সেলাই করিতেছিলেন, তখনও আমি রুগ্নশয্যা পরিত্যাগ করিতে পারি নাই। আমি একমনে তাঁহার অঙ্গুলি-গুলির নিপুণ গতি দেখিতেছিলাম। সহসা ননী "উঃ" বলিয়া ছুঁচ ফেলিয়া দিলেন। অঙ্গুলির একস্থানে একটু রক্ত দেখা দিল। আমি ত্রস্তভাবে তাঁহার অঙ্গুলিটি লইয়া টিপিয়া দিলাম। বেদনার অবসান হইল, কিন্তু তখনও সে কর আমার করে ছিল। ননী হাত সরাইয়া লইলেন না। আমি সাহসভরে বলিলাম, "ননী, তুমিই আমার স্পর্দ্ধা বাড়াইয়াছিলে, তুমিই আবার তাহা খর্ব্ব করিয়া দিয়াছ। আমাকে ক্ষমা করিয়াছ কি?"

"তুমি ত কখনও কিছু অন্যায় কর নাই; এ কথা বলিতেছ কেন?"

আমি তাঁহার ললাটের কুঞ্চিত উদ্দাম কেশগুলি সরাইয়া

দিয়া বলিলাম, "যদি বাঁচি, আর যদি কখনও তোমার উপযুক্ত হইতে পারি, তখন কি আমাকে মনে রাখিবে ?"

ননী কোনও উত্তর করিতে পারিলেন না, তাঁহার মুখের স্নিগ্ধ, সলজ্জ, রক্তিম ভাব এবং হস্তের নিবিড় স্পর্শ আমার প্রশ্নের যথেষ্ট উত্তর দান করিল।

এই সময় দিদি সে কক্ষে প্রবেশ করিলেন। ননী সসম্ভ্রমে আসন হইতে উঠিয়া গেলেন।

* * *

ননীর উৎসাহে সেই বৎসরই বিলাতযাত্রা করিলাম। তিন বৎসর অক্লান্ত অধ্যবসায়ের ফলে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী ও আইনের ডিগ্রী লইয়া দেশে ফিরিলাম। প্রবাসে সূর্য্যকান্ত বাবুর স্নেহপূর্ণ পত্র ও তাহার সঙ্গে ননীর প্রীতিসম্ভাষণ আমাকে উৎসাহিত করিত। কিন্তু যাঁহার জন্য এত পরিশ্রম ও প্রবাস-ক্লেশ স্বীকার করিলাম, দেশে প্রত্যাগত হইয়া শুনিলাম, তিনি আর ইহলোকে নাই।

এখনও আমি প্রতিবৎসর আদালত বন্ধ হইলে পুরীতে গিয়া থাকি ; এখনও বিজন সন্ধ্যায় সমুদ্রগর্জ্জনে আমি ননীর আহ্বান শুনিয়া থাকি। যক্ষ্মারোগে কাতর হইয়া ননী, তাঁহার আপনার ইচ্ছায়, পুরীর সমুদ্রতটে বালুরাশিতে দেহ মিশাইয়াছিলেন। তাই সে তীর্থ আমি ভুলিয়া থাকিতে পারি না।

ঘুমের পাহাড়।

হিমালয়ের অভ্রভেদী অগণিত শৃঙ্গরাজি যেখানে নীলাকাশের গায়ে ঢেউ খেলিয়া গিয়াছে, তাহারই একটী সুরম্য উপত্যকায় আজ আনন্দের মহা কোলাহল পড়িয়াছে। আজ পার্ব্বতীয় সরদার দলবীর সিংহের গৃহে মহাকালের পূজা। সরদারের কাষ্ঠ নির্ম্মিত গৃহ নানাবর্ণের বিচিত্র পতাকায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। পার্ব্বতীয়েরা দীর্ঘ রঞ্জিত পতাকার অসংখ্য মাল্য রচনা করিয়া গিরিশিরে, তোরণে, বৃক্ষবাটিকায় এবং পর্ব্বতগাত্রে যথেচ্ছভাবে প্রলম্বিত করিয়া দিয়াছে।

গৃহের সম্মুখ ভাগে স্তূপীকৃত শিলাখণ্ডের দ্বারা মহাকালের মন্দির কল্পিত। তাহারই নিকটে উন্মুক্ত গগনতলে অসংখ্য লোকের সমাবেশ হইয়াছে। পার্ব্বতীয়া রমণীরা নানা বর্ণে রঞ্জিত বসনে সজ্জিত হইয়া, খদির প্রভৃতির প্রসাধনে মুখশ্রী বিবর্দ্ধিত করিয়া, বেণী দোলাইয়া হর্ষ কোলাহল পরিহাসের স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছে। পুরুষেরা অপেক্ষাকৃত গম্ভীর ভাবে রমণীগণের হাস্যচপলতায় যোগদান করিতেছিল; কেহ কেহ দূরে থাকিয়া তাহা উপভোগ করিতেছিল, কেহবা সে প্রগল্‌ভতা সঙ্কুচিত করিবার চেষ্টা করিতেছিল।

জনতার সম্মুখভাগে কিঞ্চিদুন্নত ভূমিতে বংশীর কোমল স্বরের সহিত যখন কতকগুলি বালিকা আসিয়া দেখা দিল তখন জনতার সেই অশ্রান্ত কোলাহল একেবারে থামিয়া গেল। বংশীবাদকেরা তাহাদের কোমল সঙ্গীতে শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয় গলাইয়া দিতেছিল। অনেকগুলি বংশীর ধ্বনি এক সঙ্গে উত্থিত হইয়া যেন বাতাসে, শৈলে, গগনে ও বনে এক অতি অপূর্ব্ব ও মধুর কোলাহল সঞ্চারিত করিয়া অন্য সমস্ত কোলাহল তাহাতে নিমজ্জিত করিয়া দিল।

শরতের অপরাহ্ন; হিমালয়ের তুষার স্নিগ্ধ রৌদ্রে সোনালী আভায় সে উপত্যকাটিকে পরম রমণীয় করিয়া তুলিয়াছিল। বর্ষণলঘু মেঘের পুঞ্জ বাতাসের আন্দোলনে মৃদু বিতাড়িত হইয়া পাহাড়ের গায়ে আশ্রয় মাগিতেছিল। এইরূপ মেঘ খণ্ড সকল নিম্নে ও ঊর্দ্ধে, পর্ব্বতের বিভিন্নস্তরে সংলগ্ন হইয়া শ্যামশষ্প-লতাদি-মণ্ডিত পর্ব্বত গাত্রে যূথিকাস্তবকের শোভা সম্পাদন করিয়া দিয়াছিল। হিমকণবাহী সমীরণের মৃদু স্পর্শ, প্রকৃতির হাস্যময়ী মূর্ত্তি, বংশীধ্বনির বিচিত্র মূর্চ্ছনা, রমণীগণের হাস্যোচ্ছল কমনীয়তা —এ সকলই সেই বিপুল জনতার হৃদয়ে বিলাসের ভাব জাগাইয়া তুলিতেছিল।

সঙ্গীত সহসা নিস্তব্ধ হইল। জনমণ্ডলী জয়ধ্বনি করিয়া বংশীবাদকদিগের নৈপুণ্য পুরস্কৃত করিল। উন্নত ভূমির পশ্চাতে

কতকগুলি দোল্‌না দুলাইয়া রাখা হইয়াছিল। বংশীবাদকদিগের সহিত যে কয়েকটী বালিকা আসিয়াছিল, তাহারা যুগপৎ ধাবিত হইয়া প্রত্যেকে এক একটী দোল্‌না অধিকার করিল। তাহাদের হাস্যচপল ঢল ঢল মূর্ত্তি এবং গতির ভঙ্গিমা দর্শকদিগের মনে আনন্দের তরঙ্গ তুলিয়া দিল।

দুই একটী বংশীর অতিক্ষীণ তানের সহিত বালিকারা দুলিতে আরম্ভ করিল। বাতাসে তাহাদের বসনাঞ্চল চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহাদের মুক্তবেণী দোলনের সঙ্গে সঙ্গে কম্পিত হইতে লাগিল; আর বালিকাগণের সস্মিত শুভ্র ললাটে কপোলে ঈষৎ স্বেদবিন্দু দেখা দিল। কিন্তু একটী বালিকা দর্শকদিগের দৃষ্টি অধিক পরিমাণে আকর্ষণ করিতেছিল। সে মাঝখানের দোলনায় অধিষ্ঠিত ছিল; তাহার দোলনা সঙ্গীতের মৃদুবিলম্বিত-লয়ের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া বহু ঊর্দ্ধে উঠিয়া আবার অবনমিত হইতেছিল। দু'একবার সে এত ঊর্দ্ধে উঠিতেছিল, যে দর্শকেরা শ্বাসরোধ করিয়া তাহার গতি লক্ষ্য করিতেছিল। তাঁহাদের মনে হইতেছিল যেন বালিকা তাহার আত্মরক্ষার কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে। তাহার অসাধারণ কৃতিত্বে এক-দিকে যেমন সকলে বিস্মিত হইতেছিল, অপরদিকে তাহার অসম-সাহসিকতায় সকলে চিন্তাকুল হইয়া পড়িতেছিল। কেন না বালিকাটি বড় সুন্দরী। তাহার বয়স পঞ্চদশ বর্ষ অতিক্রম করে

নাই। বালিকার সর্ব্বাঙ্গে যেন রূপ উছলিয়া পড়িতেছিল। তাহার অলকদাম সে চম্পকগৌর ললাটে যেন চিত্রকরের কারু-নিপুণতা সম্পাদন করিয়াছে। অতিরিক্ত শ্রমের ফলে তাহার সুগঠিত বক্ষ উচ্ছ্বসিত হইতেছিল, কিন্তু তাহার সহাস আননে সরলতার দিব্য দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

বংশীরব নীরব হইল। বালিকারা যুগপৎ দোলনা হইতে অবতরণ করিয়া অন্তর্হিত হইয়া গেল। অভিনয় ভূমিতে রহিল —কেবল সেই পঞ্চদশবর্ষীয়া বালিকা। সে কিছুক্ষণ তাহার দীর্ঘ বেণী ও বিদ্রোহী অলকদাম সুবিন্যস্ত করিতে মনোনিবেশ করিল। ততক্ষণ জনমণ্ডলী-মধ্যে তাহার প্রশংসাবাদ ব্যতীত অন্য কোন কথাই শ্রুত হয় নাই। কোনও কোনও যুবতীর বদনমণ্ডল যে ঈষৎ ঈর্ষার প্রভাবে রক্তিম হইয়া উঠে নাই, তাহা বলা যায় না; তাহাদের প্রণয়ীর সমক্ষে তাহারা এই একবার মাত্র মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

কিছুক্ষণ পরে পশ্চাৎ হইতে একজন সেই বালিকাকে ডাকিল, —"শৈলী" (বালিকা তাহার মাতাপিতার তৃতীয়া কন্যা, এই জন্য সকলে তাহাকে "শাইলী" বা "শৈলী" বলিয়া ডাকিত)। বালিকা আহ্বান শুনিয়া অবহিত হইল। তখন সে ব্যক্তি পর পর কয়েক খানি তীক্ষ্ণফলকবিশিষ্ট ছুরিকা সেই বালিকার দিকে নিক্ষেপ করিল। শৈলী অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সহিত সেগুলির অপর দিক

ধরিয়া ফেলিয়াই ভূমিতে নিক্ষেপ করিল। এইবার বালিকা ধীরে ধীরে আবার ছুরিকাগুলি ভূমি হইতে তুলিয়া লইতে লাগিল এবং শূন্যে নিক্ষেপ করিয়া ধরিতে লাগিল। একখানি, দুইখানি, তিনখানি এইরূপে যখন আটখানি ছুরিকা লইয়া বালিকা লুফিতে লাগিল এবং সেই সকল ছুরিকার অগ্রভাগ অপরাহ্ণের মৃদু রবিকরে মধ্যে মধ্যে ঝলসিয়া উঠিতে লাগিল, তখন দর্শকেরা বিস্ফারিত-নয়নে তাহার সেই বিচিত্র লীলা নিরীক্ষণ করিতেছিল, আর মধ্যে মধ্যে জয়ধ্বনি করিতেছিল। কিন্তু বালিকার মনোযোগ সেদিকে ছিল না। সে অনন্যমনে তাহার হস্তনিক্ষিপ্ত ছুরিকা-গুলির গতি অনুসরণ করিতেছিল। তাহার মুখে যেন হাসির রেখাটুকু সর্ব্বদা লাগিয়াই ছিল, আর তাহার ঈষৎ নৃত্যের ছন্দ তাহার গতি ও অঙ্গভঙ্গীকে অতি রমণীয় করিয়া তুলিয়া-ছিল। বালিকা ক্রমে সেই উচ্চ অভিনয় ভূমির সম্মুখে আসিয়া উপনীত হইয়াছে। ছুরিকাগুলি ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধতর দেশে নিক্ষিপ্ত হইয়া নিকটস্থ দর্শকদিগের হৃদয়ে যে কিঞ্চিৎ আশঙ্কার সঞ্চার করিতেছিল না, তাহা নহে। তারপর একবার একখানি ছুরিকা যখন বালিকার হস্তস্খলিত হইয়া দূরে বিক্ষিপ্ত হইল, তখন সম্মুখভাগের দর্শকবৃন্দ বিচলিত হইয়া উঠিল। কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্য, দর্শকদিগের মধ্যে চতুর্থ সারিতে একটী যুবক বসিয়াছিল সে হস্ত প্রসারিত করিয়া মুহূর্ত্তে সে তীক্ষ্ণ ছুরিকার

অগ্রভাগ ধরিয়া ফেলিল ; এবং নিমেষ মধ্যে সে ছুরিকা পুনরায় বালিকার করতলগত হইল।

বালিকা আবার তাহার ক্রীড়ায় নিবিষ্ট হইল, কিন্তু এবার অপেক্ষাকৃত ধীরে। ছুরিকার অগ্রভাগে রক্তচিহ্ন বালিকার চক্ষু এড়াইতে পারে নাই। সেই রক্তচিহ্ন দেখিয়া তাহার চোখের পাতা আর্দ্র হইয়াছিল এবং তাহার অধরোষ্ঠ ঈষৎ স্ফুরিত হইয়া উঠিল।

অল্পক্ষণ পরেই ক্রীড়া থামিয়া গেল। ছুরিকা কয়খানি যত্নে গুছাইয়া লইয়া বালিকা সে উচ্চভূমির অপর দিক দিয়া নামিয়া গেল। কিন্তু সে, যাইবার পূর্ব্বে, তাহার চক্ষু দুটী তাহার উপকারক যুবকের মুখমণ্ডলে কিছুক্ষণের জন্য স্থাপিত করিয়াছিল।

সন্ধ্যার আরতি ও বহুলোকের কলকণ্ঠোচ্চারিত সঙ্গীতে হিমালয়ের সানুপ্রদেশ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। মহাকাল-পূজার সে উৎসব বহুক্ষণ ধরিয়া চলিল; এমন কি শুক্লা সপ্তমীর চন্দ্র যখন অস্তমিত হইয়া গেল, তখনও অনেকগুলি নরনারী সুরার অবারিত প্রবাহে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া নানাবিধ বিকট চীৎকারে সেই নিষুপ্ত পার্ব্বত্যপ্রদেশে দলবীর সিংহের ঐশ্বর্য্য ঘোষণা করিতেছিল।

সন্ধ্যার আরতির অব্যবহিত পরেই যে এক পশলা বৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গেই অধিকাংশ লোক গৃহাভিমুখে ধাবিত হইয়াছিল। পার্ব্বতীয়েরা যখন মৃগ শিশুর ন্যায় লম্ফ দিয়া দিয়া কখনও নিম্নে কখনও উর্দ্ধে ধাবিত হইতেছিল, তখন তাহাদের হাস্যকলরবে সেই মৌন বনভূমি যেন চতুর্দ্দিক হইতে সাড়া দিয়া উঠিল। তার পর বৃষ্টি থামিয়া গেল বটে কিন্তু কুয়াসার আকারে মেঘগুলি সমস্ত প্রদেশকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল; তখন অনিচ্ছা-সত্বেও সকলে ধীরপদে যাইতে বাধ্য হইল। কারণ পর্ব্বতো-পান্তের সেই পিচ্ছিল পথে পদস্খলন হইলে, একেবারে অতলস্পর্শ নিম্নে পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা ছিল। কুজ্ঝটিকাও এমন প্রবল ভাবে সকলকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল যে কয়েকপদ দূরের লোককেও কেহ সহসা চিনিতে পারিতেছিল না। সন্ধ্যার অন্ধকারে সে কুজ্ঝটিকা আরও দুর্ভেদ্য বলিয়া মনে হইতেছিল।

একটী বালিকা কিছু দ্রুত পদে চলিতেছিল। সঙ্গীদিগের মধ্যে কেহ কেহ তাহাকে সাবধান হইবার জন্য বলিল কেহ বা তাহাকে একটু ব্যঙ্গ করিল। কিন্তু বালিকা আরও দ্রুতপদে চলিতে আরম্ভ করিল। সহসা কে তাহার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিল? বালিকা ফিরিয়া চাহিল, চাহিয়াই গম্ভীর হইয়া দাঁড়াইল। যে তাহার স্কন্ধে হস্ত রক্ষা করিয়াছিল সে বলিল,

"শৈলী, একটু ধীরে—একটু ধীরে, শৈলী!"

শৈলী হাসিল, বলিল "কেন, পড়িয়া যাইব ?"

যুবকও হাসিতে হাসিতে বলিল, "বিচিত্র কি ?"

শৈলী বলিল, "তোমার ভয় করে ?"

যুবক বলিল, "আরে পাগ্‌লী, আমার ভয় করিবে কেন ? তোর জন্যে যে ভয় হচ্চে।"

শৈলী শুধু হাসিল তারপরেই সে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। যুবক এবারে তাহাকে আর বাধা দিল না। নিজেও তাহার পশ্চাতে ছুটিল এবং অনেকগুলি চড়াই ও উৎরাই অবলীলাক্রমে অতিক্রম করিয়া অপেক্ষাকৃত পরিসর ক্ষেত্রে আসিয়া উপনীত হইল। সেখানে কয়েকখানি প্রস্তরখণ্ড এমনভাবে পড়িয়াছিল যে সে পথে যাইবার সময় কেহ তাহার উপর না বসিয়া যাইতে পারিত না। যুবক ও শৈলী একখানি বৃহৎ শৈলখণ্ডের উপর পাশাপাশি উপবেশন করিল। কিছুক্ষণ কেহই কিছু বলিল না। যে দীর্ঘপথ তাহারা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছিল, তাহাতে আপাততঃ এই বিশ্রাম সুখলাভ করিয়া তাহা মৌনভাবে পূর্ণ মাত্রায় তাহারা আস্বাদন করিতেছিল। চতুর্দ্দিকের প্রকৃতিও তাহাদিগকে যেন মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। লঘুবর্ষণের পর নীলাকাশে শরতের চন্দ্র শুভ্র জ্যোৎস্নার রজতবন্যা বহাইয়াছিলেন। অদূরে পর্ব্বতগাত্র বহিয়া একটি ঝোড় বা ঝরণা কুলু কুলু শব্দে অধীর পুলকে প্রবাহিত হইতেছিল। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে,

কাজেই ঝরণাটী আজ শত ধারায় নাচিয়া, ফুলিয়া, গান করিয়া পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতে লাফাইয়া লাফাইয়া চলিতেছিল। সে নির্জ্জন পার্ব্বত্য বনভূমিতে জ্যোৎস্নালোকে পুলকিত অশান্ত নির্ঝর অত্যুন্নত পর্ব্বতরাজি হইতে প্রবাহিত হইয়া অলকনন্দার একটী ধারার ন্যায় বোধ হইতেছিল। পর্ব্বতগাত্রে গুল্মপুষ্প প্রভৃতি হইতে একটী মৃদু সুগন্ধ ভাসিয়া ভাসিয়া সমীরণে ও চন্দ্র কিরণে সঞ্চারিত হইতেছিল।

তাহাদের সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া যুবক প্রথমে জিজ্ঞাসা করিল, "শৈলী, তোমার ঘর কত দূরে?"

শৈলী বলিল, "ঐ যে পাহাড়টা, ওর অপর পারে। তুমি আমার নাম কি করিয়া জানিলে?"

যুবক উৎসাহের সহিত বলিল "আজ তোমার নাম কে না জানে? আজ কাহারও মুখে অন্য কথা নাই, কেবল তোমার সেই খেলারই কথা।"

বালিকা হাসিয়া উঠিল। বলিল "ও ত সবাই পারে। তাহাতে আবার লোকে নাম করিবে কেন? তোমার নাম ত আমি জানি না।"

যুবক একটু অপ্রতিভভাবে বলিল "আমার নাম জানিবে কেন? আমি ত আর তোমার মত 'নাম' করিতে পারি নাই।"

বালিকা একটু গম্ভীর হইল; বলিল—"তুমি আজ যে অদ্ভুত কৌশল দেখাইয়াছ, তাহা ওই অত লোকের মধ্যে আর এক জনও দেখাইতে পারিত না। ছুরী খানার ধারের দিকটা কেন ধরিলে? তোমার নিশ্চয়ই খুব লাগিয়াছিল! দেখি" বলিয়া শৈলী যুবকের দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ করিল। যুবক হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বলিল—"কিছুই নয়; তোমার তা মনে আছে, শৈলী?"

"মনে আর থাকিবে না? তুমি আমায় আজ বাঁচাইয়া দিয়াছ। আমি আর ও খেলা কখনও খেলিব না।"

অভিমানে বালিকার ওষ্ঠাধর স্ফুরিত হইয়া উঠিল। যুবকের হস্ত নিজের হস্তের মধ্যে লইয়া সে দেখিল যে তাহার করতলের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত একটি দীর্ঘ শোণিত-রেখা রহিয়াছে; তখনও রক্ত শুকায় নাই। বালিকা শিহরিয়া উঠিল এবং যুবকের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহাকে ঝরণার নিকট লইয়া গিয়া সযত্নে সে শোণিত-চিহ্ন প্রক্ষালিত করিয়া দিল।

সহসা গগনে মেঘ উঠিল। ক্রমে সে মেঘ নীচে নামিয়া গাঢ় কুয়াসার মত সে পর্ব্বতমালা, উপত্যকা, নির্ঝর, সে সুন্দর জোছনা সব আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল; বৃহৎ প্রকৃতিগ্রন্থের একটি পৃষ্ঠা যেন একেবারে মুছিয়া দিল। সে অন্ধকারে দৃষ্টি শক্তি একেবারে ব্যর্থ। যুবক জিজ্ঞাসা করিল "শৈলী ভয় করিতেছে না ত?"

বলিকা উত্তর করিল, "তুমি যে কাছে রহিয়াছ, ভয় করিবে কেন ?"

বালিকার হৃদয়ে এ নির্ভর কে আনিয়া দিল ? যুবক তাহার কে ?

শৈলীকে পৌঁছিয়া দিয়া যুবক যখন নিজ গৃহে উপনীত হইল, চন্দ্র তখন অস্তে গিয়াছে।

শরৎ তাহার সোনালী রৌদ্র ও শুভ্র জোছনা লইয়া বিদায় লইবার পূর্ব্বেই সেই যুবকের সহিত শৈলীর বিবাহ হইয়া গিয়াছিল। শৈলী শৈশবে মাতৃহীনা। তাহার পিতা সুরার প্রসাদে সংসারের ভাবনা মন হইতে দূর করিয়া দিতে পারিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে শৈলীর তত্ত্বাবধান করিবার কেহই ছিল না। তারপর একদিন যখন একটী বলিষ্ঠ, প্রিয়দর্শন যুবক তাহার পাণিপ্রার্থী হইল এবং কিছু অর্থও দিতে সম্মত হইল, তখন শৈলীর পিতা সানন্দে বিবাহে সম্মতি দিল।

শৈলীর স্বামী শিলাজি, শিলাজিৎ বা শিলাদিত্য তাহার প্রতিবেশীদিগের মধ্যে কর্ম্মঠ শিল্পী বলিয়া পরিচিত ছিল। বস্তুতঃ তথায় কেহ গৃহনির্ম্মাণ করিতে হইলে বা গৃহ সাজাইতে হইলে অগ্রে শিলাজির নাম স্মরণ না করিয়া পারিত না। সে উপত্যকার

দারুনির্ম্মিত অনেক গৃহে শিলাজির কারুনিপুণতা আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে।

শৈলীকে বিবাহ করিয়া প্রথমতঃ শিলাজি শ্বশুর গৃহেই অবস্থান করিতেছিল কিন্তু শৈলীর পিতার অত্যাচারে সে শৈলীকে লইয়া দূরে একটি পর্ব্বতশৃঙ্গে তাহার নিজের জন্য ক্ষুদ্র অথচ সুরম্য বাসভবন প্রস্তুত করিয়া লইল।

সে পর্ব্বতশৃঙ্গটি বড় মনোরম। অনেকগুলি পর্ব্বতের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শৃঙ্গরাজি অশ্বক্ষুরাকারে ইহাকে বেষ্টন করিয়াছে। ইহার একদিকে অদ্রিশ্রেণী ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর হইয়া আকাশে গিয়া মিশিয়াছে। অপর দিকে অতলস্পর্শ গভীর খাদ। কাঞ্চনজঙ্ঘা এবং নরসিংহের তুষারাবৃত রজতশুভ্র শির যখন প্রভাতের রৌদ্রে ঝলসিয়া উঠিত, তখন দম্পতি তাহাদের গৃহের সম্মুখভাগে একখানি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয়া একদৃষ্টে তাহা নিরীক্ষণ করিত ও অতুল আনন্দ উপভোগ করিত। দেবদারু পিয়াল প্রভৃতি বনস্পতি তাহাদের এই নবনির্ম্মিত বাসভবনটিকে কুঞ্জভবনে পরিণত করিয়াছিল। সর্ব্ব ঋতুতে মেঘের শ্রেণী এই উচ্চ শৃঙ্গটিকে স্নিগ্ধ ও শীতল করিয়া রাখে। ইহাকেই লোকে বলে "ঘুমের পাহাড়।"

এই রমণীয় পর্ব্বতের একান্ত নির্জ্জনতায়, অজস্র প্রাকৃতিক শোভারাশির মধ্যে, নবদম্পতির জীবন সুখে কাটিয়া যাইতেছিল।

শিলাজি কখনও কখনও কার্য্যের অনুরোধে বাহিরে যাইতে বাধ্য হইত। কিন্তু সে নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে। শৈলীকে ছাড়িয়া সে যতক্ষণ বাহিরে থাকিত, ততক্ষণ তাহার মুহূর্ত্তের জন্য শান্তি থাকিত না। শৈলীও স্বামীর বিচ্ছেদ ভুলিয়া থাকিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইত। সে কখনও ঝরণায় জল আনিতে যাইত এবং মুগ্ধ হইয়া তাহার কুলু কুলু রব শুনিত; কখনও প্রজাপতির সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া তাহার পশ্চাতে ছুটিত; কখনও ফুল তুলিয়া কেশে পরিত, নয়ত মালা গাঁথিয়া গৃহদ্বারে দোলাইত! এমনি করিয়া তাহাদের বিবাহিত জীবন সুখে কাটিতেছিল। পতি-সোহাগিনী শৈলী তাহার শৈলসুলভ উদ্দাম প্রকৃতি একেবারে পরিত্যাগ না করিলেও, তাহার সমগ্র হৃদয়ের আশা আকাঙ্ক্ষা প্রেম পতির হৃদয়ে ঢালিয়া দিয়া তাহারই জীবনের মধ্যে আপনার জীবনটি সম্পূর্ণ নিমজ্জিত করিয়া দিয়াছিল। সে স্বামী ভিন্ন জগতে আর কিছুই জানিত না।

জীবনের স্রোত একভাবে বহে না। শৈলীর জীবনস্রোত এতদিন আলোকে পুলকে উছলিত হইয়া বহিয়া যাইতেছিল। সে স্রোত যে কখনও বাধা পাইতে পারে বা একেবারে শুষ্ক হইয়া যাইতে পারে, তাহা কাহারও মনে হয় নাই। কিন্তু সহসা স্রোত ফিরিল।

ঘুমের পাহাড়।

বিবাহের পর কিছুকাল সুখে কাটিয়া গিয়াছে। স্বাস্থ্য-সম্পদ্-গর্ব্বিত শিলাজির দেহে রোগ দেখা দিল। তাহার স্বাভাবিক প্রফুল্লতা, বিবাহিত জীবনের প্রণয়পুলকিত প্রাণভরা আনন্দ এবং শৈলীর অক্লান্ত শুশ্রূষা শিলাজিকে রোগের যন্ত্রণা ভাল করিয়া বুঝিতে দেয় নাই। কিন্তু ক্রমেই তাহার শরীরে বলের অভাব ঘটিতে লাগিল। ক্রমে সে কাজ কর্ম্ম করিতে অক্ষম হইয়া পড়িল। তখন সংসার যাত্রার চিন্তায় সে আকুল হইয়া পড়িল। রোগমুক্তির আশা যতই দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল, ততই অন্নের ভাবনা সহস্র বিভীষিকা লইয়া তাহার হৃদয়ে দেখা দিল।

কিন্তু শৈলী একটুও বিচলিত হয় নাই। এই সময়ে আবার তাহার পার্ব্বতীয়া প্রকৃতি তাহার কমনীয়তাকে কিছু দিনের জন্য অপসারিত করিয়া দিল। আবার সে পূর্ব্বের মত চঞ্চলতা অবলম্বন করিল, আবার সে অবলীলাক্রমে পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতান্তরে ছুটিয়া দণ্ডের পথ নিমেষে অতিক্রম করিতে লাগিল। স্বামী যখন শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিল, তখন সে তাহাদের সংসারের অবস্থা ভাল করিয়া বুঝিয়া লইল। এবং দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত স্বামীর রোগে সান্ত্বনা দিতে ও সংসারের অভাব দূর করিতে তৎপর হইল। তাহাদের প্রাঙ্গণজাত সবজী বা পর্ব্বত হইতে সংগৃহীত গৃহের উপাদান বাজারে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিয়া, সেই অর্থে শৈলী স্বামীর জন্য খাদ্য ও সুস্বাদু ফল

কিনিয়া আনিত এবং গৃহে ফিরিয়া হাসিয়া খেলিয়া স্বামীকে খাওয়াইত ও সোহাগ করিত। তখন শিলাজির চোখে জল আসিত। শিলাজি বলিত, "তুমি তোমার উপার্জ্জিত অর্থে আমায় যেমন করিয়া পালন করিলে, শৈলী, আমি কখনও তোমাকে তেমন করিয়া পালন করিতে পারি নাই।"

শৈলী হাসিয়া বলিত, "বাঃ আমার ত কখনও অসুখ হয় নাই। যখন আমার অসুখ হ'বে তখন তুমি আমায় কত যত্ন ক'রবে। সত্যি বল্‌ছি, সে কথা যখন মনে হয়, তখন আমার ইচ্ছা হয়, তুমি সারিয়া উঠিলে যেন আমার অসুখ হয়!"

শিলাজি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিত, "যে পরিশ্রম করিতেছ, তাহাতে আমার অসুখ ভাল হইবার আগেই হয় ত তুমি পড়িবে।"

চোখের জল রুদ্ধ করিয়া শৈলী উত্তর করিত, "বেশ ত! আমি আর তা'হলে বাহিরে যেতে পাব না; দিন রাত তোমার পায়ের কাছে শুয়ে থাক্‌ব।"

"কিন্তু না খেয়ে যে মারা যাব।"

শিলাজির কথায় বাধা দিয়া শৈলী বলিত, "দুজনে এক সঙ্গে হাসিতে হাসিতে চলিয়া যাইব! তোমার ভয় করে?"

"না—শৈলী ভয় করে না, তোর জন্য কেবল দুঃখ হয়। এত রূপ, এ যৌবন, এমন মধুর স্বভাব!—এ সুন্দর ফুল আমারই জন্য শুকাইয়া যাইবে—"

"তোমার আর ব্যাখ্যা করিতে হইবে না" বলিয়া শৈলী তাহার স্বামীর গলদেশ বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া তাহার সমস্ত দুঃখ ভুলাইয়া দিত।

আজ কয়েকদিন শিলাজির কুটীর বিষাদ-সমাচ্ছন্ন। শিলাজি শয্যায় ছটফট করিতেছিল, আর বিস্ফারিত নয়নে দ্বারের দিকে, পথের দিকে, গবাক্ষপথে গগনের দিকে চাহিয়া অসহ্য যন্ত্রণায় কাল কাটাইতেছিল। "শৈলী তাহারই জন্য আজ কয়েকদিন হইল বাজার করিতে গিয়াছে, আর সে আসে নাই। সে কি আর আসিবে না? শিলাজির সমস্ত হৃদয় মথিত করিয়া এক একটি সুদীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে কেবলই ঐ প্রশ্ন মনে আসিতেছিল— সে কি আর আসিবে না? অমনি তাহার ললাটে স্বেদবিন্দু দেখা দিতেছিল।

প্রভাত যখন বিহগরবে বিভোর হইয়া পূর্ব্বগগনে দেখা দেয়, তখন শিলাজি মনে করে, শৈলী এখনই আসিবে। মধ্যাহ্ন যখন অপরাহ্নে গিয়া মিশে, তৃষ্ণায় যখন সে ব্যাকুল হইয়া উঠে তখন সে মনে করে, বিধাতা, এখনও কি শৈলী আসিবে না? সন্ধ্যার অন্ধকার যখন ঘনাইয়া আসে দূরের স্বর্ণচূড় শৃঙ্গরাজি গগনপট হইতে মুছিয়া যায়, তখনও শিলাজি বাহিরের একখানি প্রস্তরের

উপর শুইয়া ভাবে, "শৈলী, এতক্ষণে আমায় মনে পড়িল কি? আয় প্রিয়তমে! জীবনের শেষ জ্যোতিটুকু তোরই মুখের উপর স্থাপিত করিবার অধিকার হইতেও বিধাতা কি আমাকে বঞ্চিত করিবেন?"

এমনই কত ভাবনা শিলাজি ভাবে। ভাবিতে ভাবিতে দুঃখে তাহার শীর্ণ হৃদয় পঞ্জর উদ্বেল হইয়া উঠিতে থাকে, চক্ষু-তারকা স্থির হইয়া আসে, ক্ষুধায় পিপাসায় শরীরের গ্রন্থি সকল শিথিল হইয়া পড়ে।

এমনি করিয়া কয়েকটি দিন কাটিয়াছে। পরস্পর সংবাদ পাইয়া তাহার প্রতিবেশীরা কেহ কেহ আসিল; দেখিল, তাহার জীবনপ্রদীপ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। কেহ কেহ করুণার বশে কিছু খাদ্য সংগ্রহ করিয়া আনিল, কিন্তু শিলাজি খাইল না। শৈলী হয়ত খায় নাই। সে হয়ত বাঁচিয়া নাই। বাঁচিয়া থাকিলে কি ভুলিয়া থাকিত? তাহারই জন্য সে যে গৃহের বাহিরে গিয়াছিল! তাহারই জন্য শৈলীর কোনও বিপদ্ ঘটিয়াছে। সে খাইবে কেমন করিয়া? শিলাজি ক্ষুধায় কাতর হইলেও কিছু খাইত না। তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া গেলেও জলের জন্য ব্যগ্র হইত না। ভাবিত, "শৈলী হয়ত কোথায়ও একবিন্দু জলের জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া মরিয়াছে।"

শেষে প্রতিবেশীরা তাহাকে বুঝাইতে লাগিল। বলিল, "শৈলী

মরে নাই ; সে অন্য কোথায়ও চলিয়া গিয়াছে। অনেক দিন রোগের শুশ্রূষা করিয়া করিয়া সে সম্ভবতঃ বিরক্ত হইয়া তাহার সংসার ত্যাগ করিয়াছে। অমন সুন্দরী, অত কাঁচা বয়সে কোনও রমণী কি শুধু রোগের শুশ্রূষা করিবার জন্য একজনের নিকট পড়িয়া থাকিতে পারে? বিশেষতঃ যে স্বামী উপার্জ্জনে অক্ষম নিজে উপার্জ্জন করিয়া কোন রমণী দীর্ঘকাল তাহার সেবা করিতে পারে? সে নিশ্চয়ই অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে।”

শিলাজি এই তিক্ত বিস্বাদ পান-পাত্র নিঃশেষে গলাধঃকরণ করিতে বাধ্য হইত। মনে করিত, “তাইত সকল সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া সে আমার জন্য কেন পড়িয়া থাকিবে? তাই সে অন্য কাহারও সংসারে চলিয়া গিয়াছে। নিশ্চয়ই সে অন্য পতি গ্রহণ করিয়াছে।” কিন্তু এরূপ চিন্তা অধিকক্ষণ তাহার মনে স্থান পাইত না। যখনই আবার শৈলীর হাস্যোজ্জ্বল মুখখানি মনে পড়িত তখনই সূর্য্যকিরণে কুয়াসার ন্যায় তাহার সমস্ত সংশয় বিলীন হইয়া যাইত।

একদিন বড় বিপদ ঘটিল। শিলাজির আত্মীয়েরা যখন বুঝিল যে, সে শৈলীর ভাবনা দিবারাত্রি ভাবিয়া ভাবিয়া মরণের পথ উন্মুক্ত করিতে বসিয়াছে, তখন তাহারা সে ভাবনা তাহার মন হইতে দূর করিবার জন্য নানা চেষ্টা করিতে লাগিল। একদিন একজন এ পর্য্যন্ত বলিল যে, শৈলীকে সে অপরের গৃহে যাইতে

দেখিয়াছে। সে নিঃসঙ্কোচে বলিয়া গেল; কিন্তু সে দেখিল না যে শিলাজির চক্ষুতে তখন তীব্র জ্যোতি বাহির হইয়াছিল; সে বুঝিল না যে তাহার এই স্বকপোলকল্পিত সংবাদ শিলাজির প্রাণে কি দারুণ শেলাঘাত করিল!

শিলাজি তখন আঙ্গিনার প্রস্তর খণ্ডের উপর বসিয়াছিল। সে কষ্টে উঠিয়া বসিল। অপরাহ্ণ তখন গোধূলির ধূসর আভায় মলিন হইয়া উঠিতেছিল। শিলাজির প্রতিবেশীরা গল্প-কৌতুকে অন্যমনস্ক ছিল। শিলাজি অতি কষ্টে, বসিয়া বসিয়া, তাহার আঙ্গিনার প্রান্তদেশে উপস্থিত হইল—যাহার নিম্নে সেই অতলস্পর্শ খাদ। এইবার সকলের দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট হইল কিন্তু তাহারা সে স্থলে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই শিলাজির দেহ চকিতে অদৃশ্য হইয়া গেল।

প্রতিবেশিগণ হাহাকার করিয়া উঠিল। কিন্তু তারপরই তাহারা ভীত চকিত ও নির্ব্বাক হইয়া রহিল। অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর দ্বারস্বরূপ সেই দুষ্প্রেক্ষ-নিম্ন গহ্বরের কিনারে তাহারা কিছুক্ষণ মূক ও নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। ক্রমে সন্ধ্যার কৃষ্ণবর্ণ পক্ষ ধীরে ধীরে প্রসারিত হইয়া সে মর্ম্মান্তিক দুর্ঘটনার উপর তাহার যবনিকাটি বিস্তৃত করিয়া দিল।

এমন সময় একটি রমণী হাঁপাইতে হাঁপাইতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং কাহাকেও লক্ষ্য না করিয়া একেবারে গৃহের

মধ্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু তার পরক্ষণেই সে ব্যস্ত হইয়া বাহিরে আসিল, এবং সকলের মুখের দিকে চাহিয়া কি যেন জিজ্ঞাসা করিবে করিবে বোধ হইল; কিন্তু তাহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

প্রতিবেশিগণের মধ্যে একজন তাহাকে ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া সহসা বলিয়া উঠিল "শৈলী, এত দিন কোথায় ছিলি?" শৈলীর নাম শুনিয়া সকলেই তাহার দিকে আসিল এবং তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

শৈলী ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, 'আমি সেদিন সিতম্পঙের বাজারে যাইতেছিলাম। এদিকে বড় দেরী হইয়া গিয়াছিল। কাজেই একটা সোজা পথ ধরিয়া চলিলাম। সে পথটা বড় খাড়াই; পর্ব্বতের গা দিয়া একেবারে নীচে নামিয়া গিয়াছে। সেই পথে নামিতে নামিতে পদস্খলন হইল, আর আমি একেবারে পাঁচ শ' হাত নীচে পড়িয়া গিয়াছিলাম। আমি অচেতন হইয়া পড়িয়াছিলাম। একজন কৃষক আমাকে কুড়াইয়া লইয়া বাঁচাইয়াছে। আমি যে কতদিন বাড়ী ছাড়িয়া গিয়াছি, তাহা ত জানি না। তোমরা বোধ হয় উঁহাকে খাওয়াইয়া বাঁচাইয়াছ? আমি ছিলাম না বলিয়া উঁহার ত কোনও কষ্ট হয় নাই?"

তাহারা কি উত্তর দিবে? সকলের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। শৈলী মনে করিয়াছিল যে, শিলাজি হয় ত প্রাঙ্গণে

কি গৃহের পার্শ্বে রহিয়াছে, তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া এখনই আসিয়া উপস্থিত হইবে। কিন্তু শিলাজি কেন এখনও আসিল না? এইবার শৈলীর বক্ষস্থল কাঁপিয়া উঠিল। তখন সে সকলের পায়ে ধরিয়া সংবাদ জানিতে চাহিল।

একজন প্রৌঢ় তাহাকে সমস্ত বিষয় বলিল। শৈলীর প্রতীক্ষায় শিলাজি কি প্রকারে কাল কাটাইয়াছে, ক্ষুধা-তৃষ্ণার অসহ্য ক্লেশে কেমন করিয়া সে খাদ্য ও জল প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, এ সমস্তই বলিল। শিলাজিকে প্রবোধ দিবার জন্য একজন প্রতিবেশী শৈলীর সম্বন্ধে যে সংবাদ প্রকাশ করিয়াছিল, তাহাও সে বলিল।

শৈলী গম্ভীরভাবে সবই শুনিল। শতধারায় তাহার চোখের জল ছুটিল। কিন্তু সে কিছুই বলিল না। বসনাঞ্চলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে সে অপর হস্তে বক্ষ চাপিয়া ধরিল। প্রতিবেশীরা মনে করিল সে শীঘ্রই শান্ত হইবে। তারপর সে গৃহাভ্যন্তরে গমন করিল এবং তাহার স্বামীর শয্যা—যাহা অযত্নে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল—পরিষ্কৃত করিল, শেষে সে যখন আঙ্গিনায় আসিয়া দেখা দিল, তখন সকলেই মনে করিল যে প্রথম শোকের বেগ অনেকটা প্রশমিত হইয়াছে।

একজন বলিল, "শৈলী, এখানে আর একলাটি কেমন করিয়া থাকিবে? আমাদের সঙ্গে এস।"

তখন নিশার অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া আসিয়াছে। উপরে সুনীল গগনতলে তারকাকুল ঝিকিমিকি করিতেছিল।

শৈলী শুষ্কস্বরে বলিল, "হ্যাঁ—যাই। তিনি কোথা হইতে পড়িয়াছেন, একবার দেখিয়া যাইব না?" সকলেই সেই দিকে অগ্রসর হইল। যখন সেই স্থানটি তাহারা দেখাইয়া দিল, তখন বিদ্যুচ্চমকের মত শৈলীও অদৃশ্য হইয়া গেল। রহিল কেবল—স্তব্ধ বিজনতা, শান্তি, আর তারকার ক্ষীণ দীপ্তি।*

---

* দারজিলিংএর নিকট ঘুমপাহাড়ের সহিত যে প্রবাদটি জড়িত রহিয়াছে তাহাই অবলম্বন করিয়া গল্পটি লিখিত। আজও অনেক প্রেমিক প্রেমিকা প্রেমের এই পুণ্যতীর্থ দর্শন করিতে গিয়া থাকেন। অনেকে বিশ্বাস করেন এখানে গেলে প্রেম সার্থক হয়।

প্রত্যাবর্ত্তন।

এক অতি অন্ধকারময়ী শ্রাবণ রজনীতে উত্তর-বঙ্গ রেলপথের হিলি ষ্টেশনের অনতিদূরে সহসা ভীষণ শ্রবণভৈরব শব্দ শ্রুত হইয়াছিল। সে আকস্মিক শ্রবণবিদারী শব্দে নিকটস্থ বাজারের অধিবাসীরা মূক ও ভয়বিহ্বল হইয়া পড়িল; কুলায়ে বিহঙ্গকুল আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল এবং সুপ্ত শিশু মাতৃক্রোড়ে চমকিয়া লুকাইল।

একখানি যাত্রীপরিপূর্ণ গাড়ি ও একখানি মালগাড়ি পরস্পর বিভিন্ন দিক হইতে দুই মহাকায় সরীসৃপের ন্যায় একই বর্ত্মে ছুটিয়া আসিতেছিল। নিশীথের অন্ধকারে তাহাদের ত্রিনেত্র ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছিল! মালগাড়ি হিলি ষ্টেশন ছাড়িয়া পূর্ণ বেগ লাভ করিয়াছে মাত্র, যাত্রীগাড়ির বেগ তখনও প্রশমিত হয় নাই। মুহূর্ত্তমধ্যে উভয় গাড়ি হইতে শ্রবণপটহবিদারক শৃঙ্গধ্বনি উত্থিত হইল এবং একত্র শতকামাননিনাদের ন্যায় ভয়াবহ শব্দ বিশ্রুত হইল। পরক্ষণেই সব নিস্তব্ধ। কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বের অতিমাত্র ব্যস্ততা শান্ত হইয়া গেল, আর মধ্যে মধ্যে সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া মানবকণ্ঠের সকরুণ আর্ত্তনাদ সেই শ্মশান-ভূমির বিভীষিকা দ্বিগুণিত করিতে লাগিল।

নিকটস্থ অধিবাসীরা যখন প্রকৃতিস্থ হইল, তখন তাহাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত সাহসী কতকগুলি যুবক লণ্ঠন ও লাঠি হাতে লইয়া যে দিক হইতে শব্দ আসিতেছিল সেই দিকে ছুটিল। তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল, কি সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে; কিন্তু তাহারা পৌঁছিবার পূর্ব্বেই ষ্টেশন-মাষ্টার সদলে ঘটনাস্থলে আসিয়া উপনীত হইয়াছিলেন। সঙ্গে রেলওয়ে পুলিশও আসিয়াছিল। তাহারা ঘটনাস্থল বেষ্টিত করিয়া একটি ব্যূহ রচনা করিল, যাহাতে কেহ প্রবেশ করিতে অথবা বাহির হইতে না পারে। বাজারের অধিবাসীরা হতাশ হইয়া ফিরিল; তাহারা শুনিল কেবল মুমূর্ষুর করুণ কণ্ঠস্বর, আর দেখিল দুইখানি ট্রেণের বিক্ষিপ্ত, বিপর্য্যস্ত ও ছিন্নভিন্ন ধ্বংসাবশেষ। পুলিশ প্রহরীর রুলের সহিত আপনাদের জীর্ণ পঞ্জরের সম্বন্ধ স্থাপন করা অপেক্ষা তাহারা সারমেয়ের ন্যায় প্রত্যাবর্ত্তন সার নীতি বলিয়া মানিল।

রেলপথের কিয়দ্দূরে প্রান্তর-পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে; তাহার দুই ধারে ঝোপ ও মাঝে মাঝে বড় বড় গাছ। সেই প্রান্তর-পথ বাহিয়া একখানি গরুর গাড়ি দুলিয়া দুলিয়া রাত্রিশেষে গন্তব্য স্থানে চলিয়াছিল। গাড়য়ান নিদ্রার প্রভাবে এ দিকে ও দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছিল ও মাঝে মাঝে গরু দুইটার প্রতি

যষ্টির সদ্ব্যবহার করিয়া তাহাদের চৈতন্য সম্পাদন করিতেছিল। হঠাৎ গরু দুইটা থমকিয়া দাঁড়াইল ; গাড়য়ানও উৎকর্ণ হইল।

পথিপার্শ্বে আর্ত্তের কাতরোক্তি শুনা গিয়াছিল। হিন্দু গাড়য়ান মনে মনে একবার রাম নাম উচ্চারণ করিল। কিন্তু পরক্ষণেই তাহার ভয় বিস্ময়ে পরিণত হইল। সে অন্ধকারে অস্পষ্টভাবে দেখিতে পাইল, রাস্তার ধারে, গাড়ির অতি নিকটে শুভ্র বসনাবৃত এক ব্যক্তি পড়িয়া রহিয়াছে।

সে ব্যক্তি ক্ষীণকণ্ঠে থামিয়া থামিয়া বলিল, "বাপু গাড়য়ান, আমি বড় বিপন্ন। আমাকে যদি একটা আশ্রয়ে পৌঁছিয়া দিতে পার, তবে দুই হাত তুলিয়া তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিব।"

গাড়য়ান বলিল, "আমার গরু সমস্ত দিন না খাইয়া পথ চলিয়াছে। আমি হিলিতে সোয়ারি নামাইয়া দিয়া ঘোড়াঘাট যাইতেছি, আমি এখন ভাড়া বহিতে পারিব না।"

আগন্তুক ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "আমিও ঘোড়াঘাটে যাব। বড় কষ্ট পাইতেছি, বাবা! তোমাকে বিশেষ খুসী করিয়া দিব। আমায় লইয়া চল, বাবা।"

গাড়য়ান কাকুতি মিনতিতে ভুলিল না ; বলিল, "আমার গরু দুইটাকে ত আর মারিয়া ফেলিতে পারি না, মহাশয়!" এই বলিয়া গাড়য়ান গরুর পৃষ্ঠে হাত দিল। "টির্-র্-র্।"

আগন্তুক বুঝিতে পারিলেন, হঠাৎ এরূপ সময় এরূপ অবস্থায়

তাঁহাকে দেখিয়া গাড়য়ানের মনে স্বভাবতঃই ভয় হইয়াছে এবং সেই জন্যই সে ইতস্ততঃ করিতেছে। তিনি বলিলেন, "বাপু, তুমি ভয় পাইতেছ? আমি ডাকাইতও নহি, খুনীও নহি। যে গতিকে আমি এ স্থানে এরূপ অবস্থায় পড়িয়াছি, সব তোমাকে বলিলে, তুমি বুঝিতে পারিবে। তোমার কোনও ভয় নাই, বাপধন আমার! আমি নিতান্ত বিপন্ন ব্রাহ্মণ।"

"ব্রাহ্মণ" এই কথা শুনিয়া হিন্দু গাড়য়ান বড় গোলোযোগে পড়িল। কিছুক্ষণ চিন্তার পর সে বলিল, "আমরা মহাশয় গরীব লোক, এক করিতে আর করিয়া ফেলি। শেষে ছাঁ-বাচ্ছার অন্ন পর্য্যন্ত মারা যাবে?"

আগন্তুক তাহাকে আশ্বাস দিলেন এবং প্রচুর পুরস্কারের প্রলোভন দেখাইয়া সম্মত করিলেন। তখন সে নামিয়া তাঁহাকে ধরিয়া গাড়িতে তুলিল এবং তামাক সাজিয়া বলিল, "ঠাবৃতা, তামাক ইচ্ছে হোক।"

ধূমপান করিয়া একটু সুস্থ হইয়া ভদ্রলোক সংক্ষেপে তাঁহার বৃত্তান্ত গাড়য়ানকে বলিলেন। আজ তিনি দিনাজপুর হইতে যে গাড়িতে ফিরিতেছিলেন সেই যাত্রীপরিপূর্ণ গাড়ি মারা পড়িয়াছে। রেলওয়ের কর্ম্মচারীরা এখনই মৃত ও আহত লোক সব গাড়ি বোঝাই করিয়া লইয়া পদ্মায় ফেলিয়া দিবে। তিনি গড়াইতে গড়াইতে ঝোপের ভিতর দিয়া ভিতর দিয়া এতদূর

আসিয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছেন। তাঁহার দুইখানি পদ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, মাথায়ও চোট লাগিয়াছে। এই বলিয়া তিনি গাড়য়ানের হাতে দশটি টাকা দিলেন; বলিলেন, "বাবা, এখন তোমার হাতে আমার প্রাণ, যদি বাঁচি তোমায় আমি আরও খুসী করিয়া দিব।"

গাড়য়ান হাতে করিয়া টাকা কয়েকটি লইল, দুই একবার নাড়িল; তাহার পর ফিরাইয়া দিয়া বলিল, "তোমার টাকা রাখিয়া দাও, ঠাকুর মহাশয়! আমি টাকা চাহি না। আমা হইতে যদি তোমার প্রাণটা বাঁচে, তবে সেই আমার লাভ। আমার ছেলেটা পুলেটা আছে, তুমি তাহাদের আশীর্ব্বাদ করিলে আমার ভাল হইবে।"

ভদ্রলোকের নিবাস মেদিনীপুর জিলায়, নাম রামশরণ চক্রবর্ত্তী; বয়স ৩৫ বৎসর, গঠন বলিষ্ঠ। তাঁহার আকারপ্রকার দেখিলে সঙ্গতিহীন বলিয়া মনে হয় না। তিনি তাঁহার এক বিধবা আত্মীয়াকে লইয়া দিনাজপুর হইতে আসিতেছিলেন। ট্রেণে যখন দুর্ঘটনা ঘটে তখন তাঁহারা একত্র ছিলেন। তাহার পর কি কি ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহা তাঁহার স্মৃতির বহির্ভূত। শীতল নৈশ বায়ু যখন তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিয়া দিল, তখন শারীরিক যন্ত্রণা অল্পক্ষণেই তাঁহাকে তাঁহার সমস্ত অবস্থা বিশদ ভাবে বুঝাইয়া দিল। তিনি শুনিয়াছিলেন যে, এরূপ ক্ষেত্রে

রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ, যাহাদের ত্রুটীতে এই সকল দুর্ঘটনা ঘটে, আপনাদের দায়িত্ব লঘু করিবার জন্য মৃত ও আহত লোকগুলিকে কোনও রকমে সরাইয়া ফেলে। সুতরাং আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি তাঁহাকে শারীরিক যন্ত্রণা উপেক্ষা করিয়া পলায়নের সামর্থ্য আনিয়া দিল।

প্রাণের আশঙ্কা যে সাময়িক উত্তেজনা তাঁহার শিরায় শিরায় সঞ্চারিত করিয়া শারীরিক যাতনাকে দূরে রাখিয়াছিল, গাড়িতে উঠিবার পর সে আশঙ্কার সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজনাও তিরোহিত হইল। তাঁহার সর্ব্ব শরীর অসাড় ও আহত পদদ্বয় অস্বাভাবিক ভারবিশিষ্ট বলিয়া বোধ হইল। তাঁহার জাগরণক্লিষ্ট চক্ষুর্দ্বয় নিমীলিত হইয়া আসিল। তিনি অবিলম্বে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

যখন তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন সূর্য্যকিরণে বনভূমি অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিয়াছে। শিশিরকণবাহী সমীরণ পথিপার্শ্বস্থ শাল, শিশু ও দেবদারু প্রভৃতি বনস্পতিশ্রেণীকে স্নিগ্ধ ও আন্দোলিত করিতেছে। প্রশস্ত বনপথ সরলভাবে বহুদূর গিয়াছে, তাহার দুই পার্শ্বে গহন অরণ্য। দেখিলে মনে হয় যেন সূর্য্যকিরণ সে অরণ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পায় না। কিন্তু মধ্যে মধ্যে লাজসম্ভ্রমানভিজ্ঞ সাঁওতাল রমণীগণের সুস্থ সবল আকৃতি ও হাস্য-চপল মুখ পথিকের মনে সে অরণ্যে লোকালয়ের সম্ভাবনার কথা আনিয়া দেয়।

সেই নির্জ্জন অরণ্যপথে ধীরমন্থর ভাবে গোশকটখানি চলিতে-ছিল। গাড়োয়ান একবার ভাল করিয়া রামশরণকে দেখিয়া লইল। তাঁহার মুখে গত রজনীর স্মৃতি ও শরীরের যন্ত্রণা বিষাদের ছবি অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিল। গাড়োয়ান কিছুই বলিল না, কিন্তু তাহার করুণ দৃষ্টি স্পষ্টভাবে সমবেদনা প্রকাশ করিল। অজ্ঞ নীচজাতীয় গাড়োয়ান নিরাশ্রয় পথিককে মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিতে পারিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেছিল।

রামশরণ জাগরিত হইবার পরই মস্তকে হাত দিলেন এবং দেখিলেন যে, আহত স্থানের কেশগুলি রক্তে জটাবদ্ধ হইয়া আছে। তিনি পদদ্বয়েও খুব বেদনা অনুভব করিলেন। তিনি ক্ষীণস্বরে একবার "মা-গো" বলিয়া উঠিলেন।

গাড়োয়ান জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু, তোমার মা আছে?"

ভদ্রলোক দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "না, বাপু, মা নাই।"

গাড়োয়ান আর কোনও কথা না কহিয়া গরু দুইটাকে নানা প্রকার ভাষায় ও ভৎর্সনায় উত্তেজিত করিতে লাগিল। কিন্তু গরু যেমন চলিতেছিল, তেমনই চলিল। সেই এক ঘেয়ে শব্দ যেমন হইতেছিল, তেমনই হইতে লাগিল। বনভাগ ছাড়িয়া পথ এখন প্রান্তরের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। দুই ধারে শস্যক্ষেত্রে সোনার ঢেউ খেলিতেছিল। কোথাও বর্ষার জল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

তড়াগের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাতে বিচিত্র বর্ণের প্রস্ফুটিত কুমুদ-রাজি প্রভাতসমীরণে আন্দোলিত হইতেছিল। মাঠের শস্যহীন প্রদেশে গো-মহিষের পাল চরিতেছিল এবং মাঝে মাঝে কৃষকগণ শস্যলোলুপ পশুদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য চীৎকার করিতেছিল।

রামশরণ ভাবিতেছিলেন, একখানি সুকুমার মুখ; তাঁহার বড় আদরের কন্যা মতিয়া তাঁহার সমস্ত মানসরাজ্য অধিকার করিয়া ছিল। যাহাকে সংসারে কেহ ভালবাসে অথবা যে কাহাকেও মনপ্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছে, তাহার পক্ষে মৃত্যু বড়ই ক্লেশকর। মরণের ছায়া যতই নিবিড় হইয়া আসিতেছিল, ততই যেন সেই ক্ষুদ্র কুসুমপেলব মুখখানি মধুর হইতে মধুরতররূপে তাঁহার স্মৃতিপটে ভাসিতেছিল। আর মনে পড়িতেছিল—তাঁহার সুখদুঃখভাগিনী স্ত্রী। সংসারে তাঁহার আপনার বলিতে আর কেহ ছিল না।

গাড়য়ান জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু, আপনি এখন কোথায় যাইবেন, ঠিক করিতেছেন?"

রামশরণ ভাবিত হইলেন।

গাড়য়ান বলিল, "তোমার বাড়ী তারে খবর দিলে পাওয়া যাইবে?

"তা' যাইতে পারে।" একটু চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন, "খবর

দিয়া কি হইবে ?আসিতে পারে এমন লোক বাড়ীতে কেহ নাই।"

রামশরণ হতাশ হইয়া পড়িলেন। কারণ, ইহার পূর্ব্বে তিনি তাঁহার প্রকৃত অবস্থা ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করেন নাই। আপাততঃ আশ্রয় পাইয়া যে শান্তি লাভ করিয়াছিলেন, সেই কষ্টলব্ধ শান্তিকে তিনি সহসা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে চাহেন নাই। তিনি মনে করিতেছিলেন, ভগবান যখন একটা উপায় করিয়া দিয়াছেন, তখন তিনিই আবার উপায় করিয়া দিবেন।

তাঁহার মনোগত ভাবের প্রতিধ্বনি করিয়া গাড়য়ান কহিল, "অত ভাবিতেছ কেন, বাবু? ভগবান একটা উপায় করিয়া দিবেই দিবে।"

সে মনে মনে একটা উপায় স্থির করিয়া উৎফুল্ল হইয়াছিল। সে বলিল, "আমার বাড়ীতে একখানা ছোট ঘর আছে, সেখানায় আমরা থাকি না। সেই ঘরে তোমাকে থাকিতে দিব। আর পাড়ার গৌর পরামাণিককে ডাকিয়া আনিব; সে খাবার জল আনিয়া দিতে পারিবে, দুধ জ্বাল দিবে; আমাদের ওখানে ভাল চিঁড়া পাওয়া যায়, ভাল আকের গুড়—"

রামশরণ তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, "সে সবই যেন হইল। আমি তোমার বাড়ীতে গেলে সে কথা ত লোকের জানিতে বাকী থাকিবে না। আর আমার সারিতে কত দিন লাগিবে, তাহার

ঠিক কি? ইহার মধ্যে যদি কোম্পানীর লোক সন্ধান পায় তবে আমাকে লইয়া গিয়া কবরই দিক্, আর পদ্মায় ফেলিয়াই দিক্, এক রকমে সরাবেই।"

কোম্পানীর লোকের ব্যবহারের সম্বন্ধে রামশরণের এমনই একটা বদ্ধমূল কুসংস্কার ছিল।

গাড়য়ান জিজ্ঞাসিল, "তোমার বাড়ীতে কে আছে?"

রামশরণ উত্তর করিলেন, "আমার স্ত্রী ও একটি চারি বৎসরের মেয়ে।"

গাড়য়ান দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল; বলিল, "আমার একটি দুই বৎসরের মেয়ে সেদিন ফাঁকি দিয়া গিয়াছে।" সে তাহার চক্ষু মুছিল। রামশরণের চক্ষুও আর্দ্র হইয়া আসিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার এখন কয়টি ছেলে?"

"দুইটি ছেলে। একটি পাঁচ বৎসরের আর একটি এই তিন মাসে পড়িয়াছে।"

রামশরণ ও গাড়য়ানের মধ্যে এইরূপ কথোপকথন অতি সাধারণ, সাংসারিক এবং হয় ত অনাবশ্যক। ইহা জানিয়া জগতের কাহারও কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। কিন্তু এই সামান্য আলাপে যে সহানুভূতির বন্ধন দুইটি বলিষ্ঠ মানব-হৃদয়কে তাহাদের অজ্ঞাতসারে আকর্ষণ করিয়া লইতেছিল, তাহা তাহাদের পক্ষে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর নহে। অর্থ সে

বন্ধনের সৃষ্টি করিতে পারে না, দারিদ্র্য তাহা শিথিল করিতে পারে না।

রামশরণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঘোড়াঘাট আর কত দূর?"

গাড়য়ান বলিল, "যাইতে দুই প্রহর অতীত হইয়া যাইবে।"

"তোমাদের বাড়ী হইতে ষ্টেশন কত পথ, মণিলাল?" গাড়য়ানের নাম মণিলাল।

"হিলি আসিতে প্রায় সারা দিনমান লাগে।"

"আর কোনও ষ্টেশন কাছে নাই?"

"দেওয়ানতলা বলিয়া আর একটা ষ্টেশন হইয়াছে। সেখানে যাইতে প্রায় 'দু পহর' লাগে, কিন্তু পথ ভাল নহে।"

রামশরণ চুপ করিয়া রহিলেন।

ঘোড়াঘাট আসিতে দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গেল। গাড়ীর শব্দ শুনিয়া গাড়য়ানের পত্নী প্রতীক্ষা করিতেছিল। আঙ্গিনায় আসিবা মাত্র সে গরু দুইটাকে খুলিয়া বিচালী দিবার জন্য গোয়ালে লইয়া গেল; অপরিচিতকে দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিল না। একটি পাঁচ বৎসরের ছেলে গাড়ী হইতে হুক্কা, কলিকা, আগুনের মাল্‌শা, বাল্‌তী একে একে সংগ্রহ করিয়া ঘরে লইয়া গেল। সেগুলি রাখিয়া সে ভদ্রলোকের সহিত আলাপ করিবার জন্য ছুটিয়া আসিল। রামশরণ এই সুস্থ সবল বালকটিকে দেখিয়া খুসী হইলেন। তিনি পাঁচটি টাকা তাহার হাতে দিতে

গেলেন। হঠাৎ বালক গম্ভীর হইয়া পড়িল, এবং তাহার পিতাকে আসিতে দেখিয়া একদৌড়ে তাহার মাতার নিকটে গেল।

পরদিন রামশরণ অসহ্য শারীরিক যন্ত্রণা ও সেই পল্লীভবনের স্নিগ্ধ স্মৃতি লইয়া কলিকাতাভিমুখে রওনা হইলেন।

পথে ট্রেণেই তাঁহার প্রবল জ্বর হইয়াছিল। শরীরের বেদনাও দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। দক্ষিণ পদের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মনে অত্যন্ত আশঙ্কা হইয়াছিল। তিনি স্থির করিলেন, কলিকাতায় গিয়া প্রথমেই মেডিকেল কলেজে যাইবেন।

পরদিন কলিকাতায় পৌঁছিয়াই রামশরণ হাঁসপাতালে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার ভর্ত্তি হইতে বিলম্ব হইল না। কুলিরা ক্যাম্বিশের দোলায় করিয়া তাঁহাকে গাড়িবারান্দা হইতে লইয়া গেল।

অপরাহ্নে ডাক্তার সাহেব আসিলেন। বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে রামশরণ সত্য গোপন করিলেন; বলিলেন,'ঘুমের ঘোরে ছাতে আসিয়াছিলেন, তাহার পর হঠাৎ ছাত হইতে পড়িয়া গিয়া এই দুর্ঘটনা ঘটে। সত্য ঘটনা ব্যক্ত করিতে তাঁহার সাহস হইল না। তিনি ভাবিলেন, কি জানি যদি কেহ এই সাহেবের নিকট প্রকৃত ঘটনা জানিতে পায়, তবে নূতন বিপত্তি ঘটিবে।

ডাক্তার সমস্ত শরীর ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলেন; মস্তকের

রক্তচিহ্ন তথনও রহিয়াছে ; পরে অবিশ্বাসের ভাবে জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি মদ খাও ?" রামশরণ উত্তর করিলেন "না, সাহেব।" ডাক্তার তাঁহার সহকারীর সহিত কিছুক্ষণ তর্কবিতর্ক করিয়া রামশরণের পদদ্বয় টিপিয়া দেখিলেন, ও মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন, "দক্ষিণপদের দুইখানা হাড়ই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।" পরক্ষণেই রোগীকে উৎসাহ প্রদান করিবার জন্য তিনি বলিলেন, "ও কিছুই নহে শীঘ্র ভাল হইয়া যাইবে। বামপদ বেশ ভালই আছে, সামান্য মালিশেই সারিয়া যাইবে ."

বাস্তবিক তাহা হইল না। বামপদ কিছুদিনের মধ্যে ভাল হইল বটে, কিন্তু দক্ষিণ পদের জন্য বড়ই ক্লেশ হইতে লাগিল। এক সময় এমন সম্ভাবনা ও হইয়াছিল যে, দক্ষিণ পদখানি বুঝি বা কাটিয়াই ফেলিতে হয়। ডাক্তার সাহেবের অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্নে পাখানি কাটিয়া ফেলিতে হইল না বটে, কিন্তু নিত্য নূতন রকমের যন্ত্রণায় রোগীর প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া উঠিল। ক্লোরো-ফরমের দ্বারা তাঁহার জ্ঞানলোপ করিয়া ডাক্তার ভগ্ন হাড়কে স্বস্থানে আনিয়া গাটাপার্চ্চার ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিলেন। অনেক-দিন পরে খুলিয়া দেখা গেল, হাড় স্বস্থানে আইসে নাই। আবার তাঁহার জ্ঞানলোপ করিয়া ভগ্ন হাড় স্বস্থানে আনিবার চেষ্টা হইল। এইরূপে বহুদিন কাটিয়া গেল। ভাঙ্গাহাড় কিছুতেই আর যোড়া লাগিতে চাহে না।

রামশরণ ক্রমেই জীবনে হতাশ হইতে লাগিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, অল্পদিনের মধ্যে আরোগ্য লাভ করিয়া গৃহে যাইতে পারিবেন। কিন্তু ক্রমেই সে আশা দূর হইতে অতি দূরে অপসারিত হইয়া গেল। তাঁহার প্রাণাধিকা কন্যা ও স্ত্রী—এ জীবনে যাহাদের মুখ আর দেখিবার আশা নাই!—তাহাদের চিন্তায় কত দীর্ঘ নিশা তিনি জাগরণে অবসান করিয়াছেন, কত দীর্ঘ দিনমান তিনি শয্যায় ছট্‌ফট্ করিয়া কাটাইয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। কোন কোন সময়ে তিনি এত অধীর হইতেন যে, তাঁহার কণ্ঠতালু শুষ্ক হইয়া যাইত, ললাটে স্বেদবিন্দু নির্গত হইত এবং সর্ব্বশরীরে জ্বরের উত্তাপ অনুভূত হইত।

মাসের পর মাস এই ভাবে কাটিতে লাগিল। রামশরণ পরিবারের কোনও সংবাদ পাইতেন না। পাইলে বোধ হয় কথঞ্চিৎ সুস্থ হইতে পারিতেন। কিন্তু সংবাদ আদানপ্রদানের পথ তিনি নিজেই রুদ্ধ করিয়াছিলেন। জীবনে তিনি হতাশ হইতেছিলেন। যখনই বাড়ীতে সংবাদ দিবার কথা তাঁহার মনে হইত, তখনই তিনি ভাবিতেন, "আর কেন? যদি বাঁচি, দেখা হইলে এক মুহূর্ত্তে সারা জীবনের দুঃখ ভুলিয়া যাইবে, আর যদি মরিতেই হয়, তবে আর হর্ষে বিষাদ কেন ঘটাইব? আশা দিয়া নিরাশ করিয়া কি হইবে? আমার মৃত্যু-সংবাদ এত দিনে অবশ্যই সেখানে পৌঁছিয়াছে। যদি মরিতেই হয়,

তবে সে ভুল ভাঙ্গিয়া লাভ কি? আবার নূতন শোকের সৃষ্টি করা বই ত নয়!"

রামশরণের একটি আত্মীয় তাঁহারে গৃহে থাকিয়া প্রতিপালিত হইয়াছিল। তাহারই উপর তাঁহার ক্ষুদ্র পরিবারের ভার দিয়া তিনি বিদেশে আসিয়াছিলেন। সময়ে সময়ে মনে হইত তাহাকে আসিতে লিখিবেন। কিন্তু তাহাকে আসিতে হইলে, তাঁহার পরিবারকে নিতান্ত নিঃসহায় অবস্থায় ফেলিয়া আসিতে হয়। রামশরণ তাহা ইচ্ছা করিতেন না। রোগমুক্তিসম্বন্ধে তাঁহার বিশ্বাস যদি এত শিথিল না হইত, তাহা হইলে হয়ত তাহাকে সংবাদ দিতেন, কিন্তু বহুদিন পর্য্যন্ত জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে যে সংগ্রাম চলিয়াছিল, তাহাতে তিনি মৃত্যুরই জয় অবশ্যম্ভাবী মনে করিয়াছিলেন, কাযেই তাঁহার এই অনিশ্চিত পরিণামের সহিত আর কাহাকেও জড়িত করিতে ইচ্ছা করেন নাই।

কখন কখন ইহাও তাঁহার মনে হইত যে, আরোগ্যলাভ করিয়া হঠাৎ একদিন তিনি গৃহে উপস্থিত হইবেন, আর তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা কন্যাকে বক্ষে ধারণ করিবেন; আর কণ্ঠ-বিলগ্না হর্ষবিহ্বলা পত্নীর সম্ভাষণের সহিত বালিকার স্নেহোচ্ছ্বাসপূর্ণ অপরিস্ফুট বাক্যামৃত উপভোগ করিবেন। সে আনন্দের দৃশ্য কল্পনা করিতে করিতে তাঁহার শরীর কণ্টকিত হইত, চক্ষু বিস্ফারিত হইত। পরক্ষণেই পারিপার্শ্বিক অবস্থা সুখের কল্পনা-

রাজ্য হইতে তাঁহাকে বলপূর্ব্বক টানিয়া আনিত। তিনি যন্ত্রণায় অধীর হইয়া উঠিতেন।

রামশরণের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবার উপক্রম হইল। সেই একই ঘর, একই শয্যা, একই শয্যার সারি। রোগীর সকরুণ আর্ত্তনাদ, মুমূর্ষুর মর্ম্মস্পর্শী কাতরতা, শুশ্রূষাকারিণীদিগের অতর্কিত পরিক্রমণ, শববাহকদিগের সতর্ক পদবিক্ষেপ—সেই একই ভাবে চলিতে লাগিল। তাহার বিরাম নাই; অথবা পরিবর্ত্তন নাই। প্রতি দিনের সেই অধীর প্রতীক্ষা—ডাক্তারের জন্য প্রতীক্ষা আহারের প্রতীক্ষা, ঔষধের প্রতীক্ষা—দীর্ঘ দিনগুলিকে আরও দীর্ঘ করিয়া তুলিত। অন্য রোগিগণের আত্মীয়স্বজন অবধারিত সময়ে আসিয়া তাহাদিগকে দেখিয়া যাইত। রামশরণের অশ্রু গণ্ডস্থল প্লাবিত করিয়া বহিত। জগতে তাঁহার এমন কেহ ছিল না যে, এই মরণপথে সান্ত্বনাবাক্যে তাঁহার শেষমুহূর্ত্ত কয়েকটি স্নিগ্ধ করিয়া দিতে পারে। এই চিন্তা তাঁহাকে পাগল করিয়া তুলিত।

যে সময় ডাক্তার আসিতেন, সেই মুহূর্ত্তগুলি রামশরণের অত্যন্ত শান্তিপ্রদ বলিয়া বোধ হইত। ডাক্তার প্রত্যহই আশ্বাস দিতেন, প্রত্যহই অবসাদক্লিষ্ট রোগযন্ত্রণাকাতর প্রাণে উৎসাহের অমিয়বারি সিঞ্চন করিতেন; আসিয়াই রোগীকে জিজ্ঞাসা করিতেন, "কেমন আছ?" বলিতেন, "ও অল্পদিনের মধ্যেই

সারিবে। ভয় কি ?” রামশরণ আশার সম্মোহন চিত্র দেখিতেন। তাঁহার কোটরপ্রবিষ্ট চক্ষুর্দ্বয় আবার উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠিত।

ট্রেণে দুর্ঘটনার পর এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। মেদিনীপুর জিলায় একখানি গণ্ডগ্রামের অপ্রশস্ত নির্জ্জন পথে শ্রান্ত পদ-বিক্ষেপে একজন পথিক গমন করিতেছিলেন। তখন শুক্লপক্ষের মেঘবিনির্ম্মুক্ত পঞ্চমীর চন্দ্র পশ্চিমগগনে ম্লান হইয়া আসিয়াছিল, ঝিল্লীরবমুখরিত পল্লীপথ কোথায়ও আম্রবনের মধ্য দিয়া, কোথায়ও প্রান্তরের কিনার দিয়া, কোথায়ও বা গৃহস্থের আঙ্গিনা দিয়া, স্নায়ুর ন্যায় গ্রামের সমস্ত কলেবরটিকে ব্যাপিয়াছিল। সেই পল্লীপথ বাহিয়া শ্রান্ত পথিক অনন্যমনে গমন করিতেছিলেন। পল্লী যেন স্পন্দহীন, নিস্তব্ধ এবং বিজন। মধ্যে মধ্যে দুই একটি কুক্কুর অশ্রান্তভাবে ডাকিয়া ডাকিয়া তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিয়া নিরস্ত হইতেছিল। অবসাদ-বিবশা যামিনী যেন সুবৃহৎ কৃষ্ণবর্ণ পক্ষদ্বয়ে অর্দ্ধব্রহ্মাণ্ডের প্রাণিকুলকে আবৃত করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছিল। একাকী পথিক সেই অন্ধ নিস্তব্ধতা অতিক্রম করিয়া চলিয়াছিলেন। তাঁহার আপাদমস্তক মলিন বসনে মণ্ডিত। শরীর দীর্ঘ কিন্তু কঙ্কালাবশিষ্ট। পদবিক্ষেপ শ্রান্ত অথচ অস্থির, তাহাতে যেন খঞ্জত্বের ভাব বিদ্যমান।

প্রত্যাবর্ত্তন।

পথিক—রামশরণ ; হাঁসপাতাল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া আশা-ভরে আজ গৃহে ফিরিতেছিলেন। কল্পিত সুখের চিত্তোন্মত্তকারী মোহ সময়কে দীর্ঘ বলিয়া প্রতীতি জন্মাইতেছিল। তাঁহার মনোরথ বহু পূর্ব্বে ছুটিয়া চলিল, আর তাঁহার সদ্যরোগবিমুক্ত খঞ্জ দেহ বহু পশ্চাতে পড়িয়া রহিল।

রামশরণ যখন তাঁহার গৃহপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার গৃহের আঙ্গিনা তৃণসমাচ্ছাদিত, সংস্কারাভাবে গৃহগুলি হতশ্রী। কিন্তু এ সকল তাঁহার আশা-আশঙ্কা-সংক্ষুব্ধ হৃদয়ে স্থান পাইল না ; মধ্যরজনীর সেই অপার্থিব নিস্তব্ধতা সেই বিরলগৃহ প্রদেশে তাঁহাকে প্রপীড়িত করিতেছিল, এবং অমঙ্গলের আভাস যেন তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছিল। প্রাঙ্গণে গিয়া কাহাকেও ডাকিবেন, সে শক্তি যেন তাঁহার ছিল না ; কণ্ঠস্বর নিরুদ্ধ। ইতস্ততঃ চাহিয়া একটি জানালায় আলোকরশ্মি দেখিয়া তাঁহার প্রাণে একটু আশার সঞ্চার হইল। তিনি মনে করিলেন, বাতায়নতলে যাইয়া অকস্মাৎ তাঁহার স্ত্রীকে ডাকিবেন। সে আনন্দের কল্পনা মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার প্রতি ধমনীতে বিদ্যুৎ ছুটাইল। তিনি অস্থিরপদে জানালার নিকটে গেলেন এবং যাহা দেখিতে পাইলেন তাহাতে তাঁহার হৃদয়ের শেষ রক্তবিন্দু যেন জমিয়া গেল। তাঁহার মস্তক ঘুরিতে

লাগিল। তিনি প্রাচীরগাত্রে আপনার দেহ মিশাইয়া দিতে চাহিলেন।

তাঁহার পরম আত্মীয়—যাহার উপর সংসারের সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন—সেই আত্মীয়টি তাঁহারই শয্যায় শয়ান, আর তাঁহার স্ত্রী সেই একই শয্যাবিলগ্না। এই সেই স্ত্রী—যাহার চিন্তায় কত বিনিদ্র রজনী প্রভাত হইয়াছে, কত অধীর কামনা শান্তি লাভ করিয়াছে, যাহার জন্য তিনি অসহ্য ক্লেশের মধ্যেও নির্ব্বাপিত জীবনবর্ত্তি বাঁচাইয়া রাখিতে চাহিয়াছিলেন! তাঁহার বুঝিতে বাকী রহিল না যে, পাপের অগ্নিশিখায় তাঁহার সুখের লতাকুঞ্জ ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। বুঝিতে বাকী রহিল না যে, ক্রূর বিধাতা তাঁহাকে হাঁসপাতালের ক্লেশহীন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন—কেবল এই হলাহলের পূর্ণপাত্র তাঁহার মুখে ধরিবার নিমিত্ত। সে গরল মুহূর্ত্তে তিনি নিঃশেষে পান করিলেন। সে পানপাত্রে তাঁহার প্রেম, তাঁহার আশা, তাঁহার উদ্যম ও ভরসা সকলই যেন বিষের ন্যায় বিলীন হইয়া গেল। বহুদিনসঞ্চিত ব্যাকুলতা শান্ত হইল! একবার মাত্র সাধ হইল,—তাঁহার বড় আদরের কন্যাটিকে দেখিবেন। দেখিলেন, যাহা দেখিবার জন্য রোগশয্যায় তাঁহার ব্যাধিক্লিষ্ট অশ্রুসিক্ত চক্ষু সর্ব্বদা ত্রস্তভাবে সেই হাঁসপাতালের গৃহের চারিদিকে অন্বেষণ করিত—সেই সুকুমার শিশু ভূমিতলে মলিন শয্যায় পড়িয়া রহিয়াছে।

তাহার কঙ্কালসার নগ্নদেহ অদৃষ্টের শেষ নির্ম্মম আঘাতের ন্যায় কঠোর বোধ হইল। দুঃখের আতিশয্য হৃদয়কে কঠিন করিয়া ফেলে, নহিলে অল্প আঘাতে যে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে চাহে, কঠিন আঘাতে তাহার কিছুই হয় না কেন?

রামশরণ সবলে জানালার গরাদে চাপিয়া ধরিলেন। সমস্ত জগৎ যেন অন্ধকার হইয়া গেল। তাঁহার সতৃষ্ণ নয়ন বালিকার পাণ্ডু গণ্ডস্থলে নিবদ্ধ ছিল। বালিকার অস্ফুট প্রলাপে তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, সে ক্ষুদ্র জীবনপ্রদীপ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, কোমল কোরকের অন্তঃসার কীট ভক্ষণ করিয়া ফেলিয়াছে। হায়! ইহাই দেখিবার জন্য তিনি এত কষ্ট সহ্য করিয়াও জীবনের সাধ করিয়াছিলেন! হায় জীবন!

অকস্মাৎ গৃহস্থিত দীপ বাতাসে কাঁপিয়া উঠিল। রামশরণের স্ত্রী জানালা বন্ধ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া আসিল। সে জানালায় আসিবার পূর্ব্বেই দীপ নিবিয়া গেল। বাহিরের অন্ধকারে রামশরণের স্ত্রী দেখিতে পাইল, একখানি পরিচিত, দীর্ঘ, পাণ্ডুর মুখ। একটি অমানুষিক চীৎকার ও তাহার সঙ্গে পতনের শব্দে রামশরণ বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার পত্নী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গিয়াছে। তিনি বলপূর্ব্বক আপনাকে জানালা হইতে ছিনাইয়া লইলেন। অকস্মাৎ তাঁহার অসাড় মস্তিষ্কে উত্তেজনা ফিরিয়া

আসিল। তিনি আবার তাঁহার পদদ্বয়ে সবলতা অনুভব করিলেন। প্রাঙ্গণের মধ্য দিয়া তিনি দ্রুতপদে গৃহত্যাগ করিলেন।

জ্যোৎস্না তখন মিলাইয়া গিয়াছে; আকাশের প্রান্তে মেঘের সারিতে চকিতে বিদ্যুৎ খেলিতেছিল। ঝোপের মধ্যে ঝিল্লীরব নিশীথের গাম্ভীর্য্য বর্দ্ধিত করিতেছিল। কোথাও নিবিড় বেতস-কুঞ্জে, ঘনপল্লবান্তরালে জোনাকীর পুঞ্জ বনভূমিকে প্রসাধিত করিয়াছিল। কিন্তু রামশরণের দৃষ্টি সেদিকে ছিল না,—কোনও দিকেই ছিল না। তাঁহার শরীর যন্ত্রের মত তাঁহাকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিল। সে গতি লক্ষ্যহীন, অনির্দ্দেশ্য অথচ অপ্রতিহত। কণ্টকে যদি পদ ক্ষত বিক্ষত হইয়া থাকে, পরিশ্রমে যদি কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া থাকে, তাহা রামশরণের জ্ঞানের সীমার মধ্যে ছিল না। তাঁহার মনে হইতেছিল, "চলিতে হইবে, এখনও দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে রহিয়াছে। গৃহ-পরিজন ছাড়িয়া দূরে, অতি দূরে যাইতে হইবে। আর এমনই চলিতে চলিতে, এমনই ভাবনাহীন, উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণে কোনও এক শুভ মুহূর্ত্তে যদি মৃত্যুর সঙ্গে আলিঙ্গন ঘটে তবেই মনস্কাম পূর্ণ হয়—অদৃষ্টের প্রতি সমুচিত প্রতিহিংসা লওয়া হয়! সংসারে আর বন্ধন নাই, জীবনে আর মমতা নাই। আশারজ্জুর একটি তারও আর ছিঁড়িতে অবশিষ্ট নাই। কন্যা—কাহার কন্যা? পাপের সংসর্গ! আর কাহারও কথা ভাবিব না, আমার কেহ নাই।"

এমনই চিন্তার স্রোত রামশরণের ক্লান্ত মস্তিষ্কে তরঙ্গ তুলিতেছিল। আবার অবসাদ আসিয়া যেন সমস্ত স্পন্দনকে অসাড় করিয়া দিল। রক্তের উষ্ণপ্রস্রবণ যেন জমিয়া গেল। একটি অশ্বত্থবৃক্ষের নিম্নে রামশরণ বসিয়া পড়িলেন। এইবার ইচ্ছা হইল, কাঁদিয়া কষ্টের লাঘব করেন। কিন্তু কাঁদিবার অধিকার হইতেও তিনি বঞ্চিত। দুই হস্তে মুখ আবৃত করিয়া তিনি বৃক্ষের শিকড়ে মস্তক রক্ষা করিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে নিদ্রা তাঁহার অবশিষ্ট চৈতন্যটুকু হরণ করিল। তাঁহার হৃদয়ের দাবদাহ স্নিগ্ধ অশ্বত্থতলে প্রশমিত হইল।

যখন রামশরণের নিদ্রাভঙ্গ হইল তখন চতুর্দ্দিক সূর্য্যকিরণে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। পক্ষিকুলের কলরবে সে পল্লীপথ ধ্বনিত; অদূরে স্রোতস্বিনীতট হইতে স্নানার্থীর কলরব আসিতেছিল। তিনি চক্ষু মুছিলেন এবং সমস্ত অবস্থাটা ভাল করিয়া একবার বুঝিয়া লইতে চেষ্টা করিলেন। এক এক করিয়া সমস্ত ঘটনাগুলি নবীন বর্ণচ্ছটায় স্মৃতিপটে উদিত হইতে লাগিল। রামশরণ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু পদ ত আর চলিতে চাহে না। হায় এই বিশাল ধরণীতে তাঁহার জন্য কি এতটুকু স্থান নাই, যথায় এই দীর্ণ দগ্ধ হৃদয় শান্তি লাভ করিতে পারে? মনে

পড়িল, মণিলালের সেই স্নিগ্ধ কুটীর, সেই পবিত্র সরলতা। তখন যদি কলিকাতায় না আসিয়া, একেবারে গৃহে আসিতাম, তাহা হইলে, তখন মরিয়াও শান্তি ছিল। আজ তাহা হইলে অদৃষ্টের এ নিষ্ঠুর কশাঘাত সহ্য করিতে হইত না। তখন আসি নাই—জীবনের মমতায়। আসি নাই—সে কাহার দোষ? আসিলে বোধ হয় এমনটি হইত না। মণিলাল বলিয়াছিল, বাড়ীতে খবর পাঠাইতে—তাহাও কেন পাঠাই নাই? হয় ত এই সকল কারণেই এই সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে! তখন যদি এক খানা চিঠি লিখিয়াও খবর লইতাম, তাহা হইলেও বুঝিত, আমি বাঁচিয়া আছি। কেন লিখি নাই? এ বুদ্ধি তখন আমার কোথা হইতে আসিল! হায় হায়, দোষ আমারই!

চিন্তার স্রোত সেই রৌদ্রতপ্ত মধ্যাহ্নে কেমন করিয়া ফিরিল, তাহা রামশরণ বুঝিতে পারিলেন না। ক্রমে ক্রমে ঘৃণা ও বৈরাগ্যের পরিবর্ত্তে তাঁহার মন অনুশোচনায় পূর্ণ হইয়া গেল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, এ শোচনীয় পরিণাম তাঁহারই রচিত। পত্নীর ব্যবহার মনে হইলে যখন ঘৃণায় ও ক্রোধে অধর কুঞ্চিত হইতেছিল, তখনই অনুকম্পা আসিয়া তাঁহার হৃদয়কে দ্রব করিয়া দিতেছিল। এমনই প্রতিকূল স্রোত তাঁহার জীর্ণ জীবনতরিখানিকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি ভাবিলেন, একটি নিরাশ্রয়া রমণী তাহার শিশুসন্তানটিকে লইয়া অকস্মাৎ এমন দুরবস্থায়

পড়িলে কি না করিতে পারে? সংসারের সঙ্গিহীন পিচ্ছিল পথে যদি তাহার পদস্খলন হয়, তবে ভগবান সে অপরাধের বিচার করিবেন। কিন্তু মানুষ তাহার নিজের দায়িত্বটুকু পরের স্কন্ধে ফেলিয়া দিলে সে কি অব্যাহতি লাভ করিবে? তাঁহার মনে হইতে লাগিল, তাঁহার নিজের দোষেই এই মহা অনর্থ ঘটিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা তিনিই অধিক অপরাধী।

রামশরণ তাঁহার এই চিন্তাস্রোত ফিরাইয়া ভিন্ন পথে পরিচালিত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন। কিন্তু উপলাহত স্রোতস্বতীর ন্যায় এমনই ভাবনা দ্বিগুণবেগে তাঁহার সমস্ত মনকে অধিকার করিয়া ফেলিল। মনে হইল, তাঁহার কন্যার কথা। সেই ক্ষীণ কণ্ঠের প্রলাপ তাঁহার কর্ণে তখনও ধ্বনিত হইতেছিল। তাহার সেই অযত্নবিস্রস্ত কেশ প্রান্তরপথে প্রতিপদে যেন তাঁহার গতিরোধ করিতে লাগিল। এইবার তিনি গৃহাভিমুখে ফিরিলেন।

তাঁহার মন অনুশোচনায় পূর্ণ। ভিতর হইতে তর্জ্জনীহেলনে কে যেন তাঁহাকেই অপরাধী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছিল। তিনি দ্রুতপদে ফিরিতে লাগিলেন। তাঁহার সমস্ত চিন্তা এখন সেই রুগ্না কন্যাটির উপর কেন্দ্রীভূত। হয়ত সে ক্ষুদ্র শেফালিকা প্রভাতের বাতাসেই ঝরিয়া গিয়াছে। গত রাত্রিতে চেষ্টা করিলেও হয়ত তাহাকে বাঁচান যাইত। তাঁহাকে দেখিলেও সে আশ্বস্ত

হইতে পারিত। "হায়, অবশেষে তাহার মৃত্যুর জন্যও কি আমাকে দায়ী হইতে হইবে?" এই চিন্তাই সমস্ত পথ তাঁহাকে প্রপীড়িত করিতে লাগিল। তিনি প্রাণপণে চলিতে লাগিলেন।

কিন্তু প্রকৃতি তাহার প্রতিশোধ লইতে ক্রটী করে না। অনশন, জাগরণ, দুঃখ, ভাবনা, অতিরিক্ত ভ্রমণ তাঁহাকে অবসন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। প্রবল ইচ্ছা সত্বেও তিনি দ্রুত চলিতে পারিলেন না। যখন তিনি তাঁহার গ্রামের সীমার মধ্যে পদার্পণ করিলেন তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আকাশ মেঘমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত, বায়ুর নিস্তব্ধতা ঝড়ের সূচনা করিতেছিল। রামশরণের মনে আশঙ্কা ঘনাইয়া আসিতেছিল। নদীতীরে চিতাগ্নি দেখিয়া রামশরণ অত্যন্ত বিচলিত হইলেন, তাঁহার বুকের মধ্যে দুরু দুরু করিয়া উঠিল। মন অমঙ্গলকেই সর্ব্বাগ্রে টানিয়া আনে।

শ্মশানের পাশ দিয়া পথ। রামশরণ একটু দাঁড়াইলেন; দেখিলেন, শব-বাহকেরা তাঁহারই প্রতিবেশী। নদীতটে চিতা ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে। চিতাগ্নির আলোক পশ্চাতে রাখিয়া তিনি সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মারা গিয়াছে কে?"

এক ব্যক্তি উত্তর করিল, "রামশরণ চক্রবর্ত্তীর স্ত্রী মারা গিয়াছে।"

রামশরণ আর কিছু না বলিয়া সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

তাঁহার সেই বিশ্বাসঘাতক আত্মীয়টিকে সে স্থানে না দেখিতে পাইয়া তিনি বিস্মিত হইলেন।

মেঘের নির্ঘোষের সঙ্গে, ঝটিকার প্রথম নিঃস্বনের সঙ্গে রামশরণের কক্ষদ্বার উন্মুক্ত হইল। এবং ঝটিকারই মত উদ্দাম বেগে রামশরণ তাঁহার কন্যার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইলেন। দুইচারিজন দয়ার্দ্রচিত্ত প্রতিবেশী সে রোগশয্যা ঘিরিয়া, যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। আর তাঁহার সেই আত্মীয়টি অনাদৃতার শুশ্রূষায় নিযুক্ত ছিল। রামশরণকে দেখিয়া সকলে সভয়ে ও সসম্ভ্রমে সরিয়া দাঁড়াইল; মনে করিল, এই আকস্মিক ঘটনায় বালিকার স্তিমিত জীবনপ্রদীপ নির্ব্বাপিত হইবে। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ। হতভাগ্যের বিদগ্ধ প্রাণে শান্তিবারি সিঞ্চন করিবার জন্য তিনি কন্যাটির জীবন রাখিয়া দিলেন।

বাঁশী-চোর।

"হা, গোপাল, এ কি হ'ল? হায়, মহাপ্রভু, এ কি করিলে?"

বৃদ্ধ পুরোহিত দেউলের মধ্যে গরুড়স্তম্ভে মাথা ঠুকিয়া গোপালের দিকে কাতর ভাবে চাহিয়া কেবল বলিতেছেন, "হায়, গোপাল, এ কি করিলে, প্রভু?"

অন্যান্য সেবকেরা মশাল ধরাইয়া, মন্দিরের বাহিরের প্রাঙ্গণে ব্যস্ত ভাবে ঘুরিতেছে, মন্দিরের মধ্যে দশটির স্থলে আজ শত ঘৃতপ্রদীপ জ্বলিতেছে; সকলে চিন্তাকুলভাবে একই স্থান শতবার অন্বেষণ করিতেছে এবং তাহার পরক্ষণেই মনে করিতেছে, সেই স্থানটিই ভাল করিয়া দেখা হয় নাই। কাহারও মুখে কথা নাই। যে ব্যক্তি প্রতিদিন ঠাকুরের নটবরবেশ, রাখালবেশ, রাজবেশ প্রভৃতি নানা বেশ রচনা করিয়া দেয়—সে বেদীর সম্মুখে দণ্ডবৎ পড়িয়া রহিয়াছে এবং মধ্যে মধ্যে কাতরস্বরে বলিতেছে, "আ-হে মহাপ্রভু!"

রজনী প্রভাতকল্পা। প্রভাতের তারা দিবাকে স্বাগত জানাইবার জন্য শুভ্র পূতবেশে পূর্ব্বগগনে প্রতীক্ষা করিতেছে। পূর্ব্বদিক্ পাণ্ডুর হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু দেউলে আজ 'মঙ্গল-ধূপে'র

আরতি বাজিয়া উঠিল না। পল্লীবাসী, কাঁসর ঘণ্টা না শুনিতে পাইয়া অভ্যস্ত সংস্কারবশে মনে করিল, এখনও প্রভাত হইতে বিলম্ব আছে। প্রতিদিন যে মঙ্গল-ধূপের বাদ্য শুনিয়া তাহাদের নিদ্রা বিদায় গ্রহণ করে।

প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই গৃহে গৃহে দুঃসংবাদ প্রচারিত হইল, "গোপালের বাঁশী চুরি গিয়াছে!" বৃদ্ধগণ কর্ণে হস্ত প্রদান করিলেন, অমঙ্গলাশঙ্কায় জননীগণ সন্তানকে বক্ষে টানিয়া লইলেন, অন্য সকলে বিস্ফারিত-বদনে শুধু চাহিয়া রহিল।

দেখিতে দেখিতে মন্দির জনাকীর্ণ হইয়া উঠিল। নিকটস্থ বকুলবন লোকের কোলাহলে তাহার বিজনশান্তি পরিহার করিল। অগণিত ভক্ত দেউলের অভ্যন্তরে, চত্বরে, সোপানোপরি করজোড়ে দাঁড়াইয়া দেবতার নিকট আকুল ভাবে প্রার্থনা করিতেছে। সে জনতা কখনও মৌনভাবে দেবতার দিকে চাহিয়া মিনতি করিতেছে, কখনও বা শত শত কণ্ঠে "হা গোপাল, হা মহাপ্রভু, হা কেশব" শব্দে মন্দিরের গম্বুজে প্রতিধ্বনিকে জাগাইয়া তুলিয়া এক তুমুল কোলাহলের সৃষ্টি করিতেছে। আবার তখনই সব নিস্তব্ধ হইয়া যাইতেছে।

বৃদ্ধ পুরোহিত তখনও গরুড়স্তম্ভের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে দেবমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া আছেন। দীর্ঘ দিবসের অনশনক্লেশ উপেক্ষা করিয়া তিনি দেবতার করুণা ভিক্ষা করিতেছেন। তাঁহার

কণ্ঠস্বর বিলুপ্ত হইয়াছে, ললাটে রক্তচিহ্ন ফুটিয়া রহিয়াছে, কিন্তু দেবতার কৃপা হইতেছে না। সে পাষাণমূর্ত্তি তেমনই স্থির, তেমনই নিশ্চল! সেই বিস্ফারিত চক্ষুর্দ্বয় তেমনই উদাসীন; অধরোষ্ঠ তেমনই অপ্রকম্পিত!

বিহ্বল জনমণ্ডলী ক্রমে চঞ্চল হইয়া উঠিল। মন্দির ত্যাগ করিবার সময় তাহারা নানা জল্পনা কল্পনা করিতে লাগিল। তাহার সারাংশ এই যে, মন্দিরের সেবকদিগের বাড়ীতে অনুসন্ধান করিলে বাঁশী নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে। বাঁশী যে সোণার!

শ্রীমতী ব্রাহ্মণবালা, মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের কন্যা। এই কন্যা ব্যতীত সংসারে বৃদ্ধের আর কেহ ছিল না। কন্যাটি মাতৃহীনা বলিয়া পিতার সমস্ত হৃদয়ের স্নেহ মন্থন করিয়া লইয়াছিল। মাতৃহীনা হইলেও শ্রীমতী সুখে লালিতা। গোপালের কৃপায় পুরোহিতের কিছুরই অভাব ছিল না। ব্রাহ্মণ কন্যাটিকে অতি যত্নে লালনপালন করিয়াছিলেন। শ্রীমতী তাঁহার অবসর-সঙ্গিনী ছিল। তিনি ভাগবত পাঠ করিতেন, শ্রীমতী তাহা একাগ্রমনে শুনিত। শুনিতে শুনিতে তাহার রোমাঞ্চ হইত, চক্ষুতে দর-বিগলিত ধারে অশ্রু বহিত, আর সমীরণতাড়িত লতিকার মত তাহার দেহযষ্টি কম্পিত হইয়া উঠিত। বৃদ্ধ পুরোহিত সযত্নে

কন্যাকে ধরিয়া পালঙ্কে শয়ন করাইয়া দিতেন, আর ভাবিতেন "ভগবান, এ কি লীলা তোমার!"

শ্রীমতী পঞ্চদশবর্ষে পদার্পণ করিলেও তাহার বিবাহ হয় নাই। ব্রাহ্মণ মনে করিতেন, "ব্যস্ততা কি? বিবাহ দিলেই ত মা আমার পরগৃহে যাইবে, আমার গৃহ যে শ্মশান হইয়া যাইবে। তখন থাকিব কি লইয়া?" পাড়ার লোক মনে করিত, "মেয়েটির যে মৃগীরোগ, হঠাৎ কখন কি হয়, বলা যায় না। বিবাহ হইয়া ফল কি?" বস্তুতঃ শ্রীমতীর অদ্ভুত ব্যবহারে সকলেই বিস্মিত হইত। সে কখনও হাসে, কখনও কাঁদে; দূরে গগননীলিমার দিকে বিস্ফারিত নয়নে চাহিয়া থাকে, সময়ে সময়ে জ্ঞানহারা হইয়া পাষাণপ্রতিমার মত নিশ্চল হইয়া যায়। প্রতিবেশীরা মনে করে, "এ আবার কি?"

শ্রীমতী রূপসী। তাহার রূপ ব্রাহ্মণের গৃহ আলো করিয়া থাকে। বকুলের মালা গাঁথিয়া যে দিন সন্ধ্যা-আরতির সময়ে শ্রীমতী দেউলে আসিয়া গোপালের গলে পরাইয়া দিয়া যাইত, সে দিন যাত্রীর দল অবাক্ হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া থাকিত। তাহাদের মনে হইত যেন সে নগ্নপদে অসংখ্য নূপুর রুণু রুণু করিয়া বাজিয়া উঠিতেছে, যেন সে গতির ছন্দে অসংখ্য কাব্য মুকুলিত হইয়া উঠিতেছে! তখন ফুলগন্ধে মন্দির আমোদিত হইত। আর দেবতার সহজ প্রফুল্লমুখ

যেন আরও মধুর হাস্য বিকীরণ করিত। ভক্ত দ্বিগুণ প্রেমে মত্ত হইয়া জয়ধ্বনি করিয়া উঠিত। বৃদ্ধ পুরোহিত গদগদভাবে যুক্ত-করে কন্যার জন্য দেবতার করুণা ভিক্ষা করিতেন।

ব্রাহ্মণবালা সদ্যোদ্ভিন্ন যৌবনকুসুমের মদিরায় বিভোর হইয়া থাকিত। পিতৃগৃহের নির্জ্জনতার মধ্যেও তাহার রমণীসুলভ অশিক্ষিতপটুতা আত্মবিকাশ করিতে ছাড়ে নাই। পুষ্পধন্বা তাঁহার চারুচাপ এই বালিকার দিকে ঈষৎ বাঁকাইতে ভুলেন নাই। সুতরাং তাহার যৌবননদী প্রেমের চন্দ্রকিরণে উচ্ছলিত হইয়া উঠিতেছিল। সে সন্নিহিত বকুলবনে যাইয়া, অপরাহ্নে ফুল কুড়াইয়া আনিত; মালা গাঁথিয়া কুন্তলে পরিত, কর্ণে পরিত, সীঁথিতে দোলাইত, আর তাহার পালঙ্কে উপাধানের উপর রাখিয়া দিত। সন্ধ্যায় স্নান করিয়া শুচিস্মিতা হইয়া সে নীলবাস-খানি সযত্নে ঘাঘরার মত করিয়া পরিত, দীপ জ্বালিত এবং শয্যার নিকটে গিয়া সেই দীপে কাহার আরতি করিত। চন্দনের ফোঁটা পরিয়া, বক্ষে কণ্ঠে চন্দনানুলেপন করিয়া সে দেবতাকে প্রণাম করিত। তাহার পর বালিকা পিতার আগমনের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিত। ব্রাহ্মণ আসিয়া কন্যাকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিতেন, তাহার পর তাহার কেশে হস্তার্পণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেন, মনে করিতেন, "বালিকার অবসরবিনোদনের ত আর কিছুই

নাই, তাই সে বেশবিন্যাস করিয়া সময় কাটাইয়া দেয়।" বৃদ্ধের চক্ষু আর্দ্র হইয়া উঠিত।

শ্রীমতীর আর একটি কাজ ছিল—শয্যা রচনা। তাহার কক্ষটি সর্ব্বদাই পরিষ্কৃত এবং কুসুম ও চন্দনের গন্ধে দেব-মন্দিরের ন্যায় আমোদিত থাকিত। শ্রীমতীর শয্যা বহুমূল্য না হইলেও পরিপাটী। প্রতিদিন অতি যত্নে সে তাহার শয্যারচনা করিত, যেন প্রেমমুগ্ধা বালিকা পতির আগমনোদ্দেশে সমস্ত শক্তি ও কল্পনা দিয়া তাহার বাসরসজ্জা সাজাইয়া রাখিতেছে। তাহার মনোচোর আসিবে কি? নিশীথে যখন পল্লী নিষুপ্ত, তখনও শ্রীমতী জাগিয়া থাকিত। বকুলফুলের মালা, শেফালির মালা, রজনীগন্ধার মালা হাতে লইয়া সাশ্রুনয়নে দেবতার নিকট প্রার্থনা করিত। জাগরণে যখন তাহার চক্ষু অলস হইয়া আসিত, অধীর প্রতীক্ষায় দেহ অবসন্ন হইয়া আসিত, তখন তাহার শরীর শয্যায় লুণ্ঠিত হইত। দিব্যগন্ধে তখন তাহার ঘর পরিপূর্ণ হইয়া যাইত। দূর হইতে বাঁশী মোহন স্বরে বাজিয়া বাজিয়া নিকটে আসিত। যমুনার উচ্ছলিত কলগীতি সমীরণের অলস পক্ষে ভাসিয়া আসিত। নূপুরের মধুরধ্বনি স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া তাহার কর্ণে অমৃতের ধারা বর্ষণ করিত। আর তাহার বাহুলতানিবদ্ধ কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে সে ঘুমাইয়া পড়িত। এমনই মধুর স্বপ্নে তাহার রজনী পোহাইত।

বাঁশী-চোর।

প্রভাতে সে দেখিত, শয্যাপার্শ্বে অলক্তকচিহ্ন, আর তাহার বক্ষ কুঙ্কুমরাগরঞ্জিত!

গোপালের বাঁশী চুরি হইবার পরে দুই একদিনের মধ্যেই রাজার লোক প্রধান পুরোহিতের দ্বারদেশে আসিয়া দেখা দিল। প্রত্যূষে ব্রাহ্মণ মঙ্গল ধূপের আরতি সমাপন করিয়া গৃহে আসিয়া দেখেন, তাঁহার প্রাঙ্গণে সশস্ত্র রাজভৃত্যগণ কোলাহল করিতেছে। শ্রীমতী তখনও স্বপ্নের স্মৃতি বক্ষে ধরিয়া নিবিড় নিদ্রায় নিমগ্ন ছিল। প্রতিবেশীরা ক্রমে আসিয়া উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণ অবিচলিত, ধীর কিন্তু গৃহানুসন্ধানের গ্লানি-নিবন্ধন ম্রিয়মাণ।

কিছুক্ষণ পরে শ্রীমতী উঠিয়া আসিয়া গবাক্ষে দর্শন দিল, প্রাঙ্গণের কোলাহল অকস্মাৎ থামিয়া গেল। গত রজনীর স্বর্গীয়-সুখস্মৃতি তাহার মুখকমলে এমন একটি স্নিগ্ধ উজ্জ্বলতার চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে যে, তাহার নিকট সমস্ত সংশয় সন্দেহ তর্কজাল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়।

কিছুক্ষণ বিস্ময়ে নির্ব্বাক থাকিয়া, কর্ম্মচারী প্রহরিগণকে গৃহে প্রবেশ করিবার অনুমতি দিলেন। ব্রাহ্মণ কন্যাকে বক্ষে লইয়া প্রাঙ্গণপার্শ্বে তমালের নিম্নে আসিয়া দাঁড়াইলেন। শ্রীমতী পিতাকে সযত্নে ধরিয়া বসাইয়া দিল। তাঁহার দেহযষ্টি অভিমান-

ভয়ে কাঁপিতেছিল। অকস্মাৎ শ্রীমতীর শয়ন-কক্ষে প্রহরীরা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। ব্রাহ্মণ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া একবার শ্রীমতীর দিকে চাহিলেন ও পরক্ষণেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রাজকর্ম্মচারী ব্রাহ্মণকে সংবাদ দিলেন যে, তাঁহার কন্যার উপাধানের নিম্নে বাঁশী পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার অনুচরেরা বাঁশী লইয়া আসিল। গোপালের বাঁশী পাওয়া গিয়াছে, এই উল্লাসে ব্রাহ্মণ বাঁশী লইবার জন্য হাত বাড়াইয়া দিলেন; তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, এই বাঁশী অব্যক্ত স্বরে তাঁহারই কলঙ্ক ঘোষণা করিতেছে। কর্ম্মচারী কঠোর হস্তে প্রহরীর নিকট হইতে বাঁশী লইলেন এবং কর্কশ স্বরে পুরোহিতকে বলিলেন, "আপনি বৃদ্ধ, আপনাকে বন্ধন করিব না, আমাদের সঙ্গে চলুন।" তাঁহার ইঙ্গিতে দুই জন প্রহরী ব্রাহ্মণের দুই হস্ত গ্রহণ করিল। এইবার ব্রাহ্মণের চক্ষুতে জল আসিল। তিনি বলিলেন, "মা, এ কি এ?"

শ্রীমতী গগনের দিকে চাহিয়াছিল। তাহার মুখমণ্ডলে, অলকদামে প্রভাত রবির কিরণ প্রতিফলিত হইয়াছিল। তাহার সে প্রশান্ত স্থির মূর্ত্তির দিকে জনতা নিস্তব্ধবিস্ময়ে চাহিয়াছিল। আনন্দে তাহার চক্ষুতে জল আসিয়াছিল। প্রতিদিন সে ত শয্যা রচনা করে, বাঁশী ত কখনও দেখে নাই! মুগ্ধা পিতার বিপদের কথা ভুলিয়া গিয়াছিল। পিপীলিকার সারির মত

জনতা যখন আঙ্গিনা হইতে অদৃশ্য হইয়া গেল, তখন বালিকা শয্যার পার্শ্বে ধূল্যবলুণ্ঠিতা হইয়া কাঁদিতে লাগিল।

বৃদ্ধ পুরোহিত নির্জ্জন কারাগৃহে বসিয়া চিন্তা করিতেছেন, "হে আমার গোপাল, এ কি করিলে, প্রভু? কন্যা ত আমার অপাপবিদ্ধা। তবে তাহার এ কলঙ্ক করিলে কেন? রমণীর কলঙ্ক করিয়াই কি তোমার আনন্দ, প্রভু? হায় হায়, এমন করিয়া কি আমার ননীর পুতুলের সর্ব্বনাশ করিতে হয়? সে কি এখনও বাঁচিয়া আছে?"

হঠাৎ ঝন্ ঝন্ শব্দে কারাগারের অর্গল মুক্ত হইল। অদূরবর্ত্তিনী উষার বায়ু ব্রাহ্মণের শরীরে স্নিগ্ধ কর বুলাইয়া দিল। ব্রাহ্মণ বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন, রাজা স্বয়ং তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত। পুরোহিত দক্ষিণ হস্তে তাঁহার শিরস্ত্রাণ স্পর্শ করিলেন। প্রহরীরা সসম্ভ্রমে সরিয়া দাঁড়াইল।

রাজা ব্রাহ্মণকে লইয়া তাঁহার পুষ্পবাটিকায় আসিলেন এবং তথায় তাঁহার গৃহদেবতার মন্দিরের শ্বেতমর্ম্মরনির্ম্মিত অলিন্দে উপবেশন করিলেন। তিনি ব্রাহ্মণকে বলিলেন যে, স্বপ্নে তাঁহার প্রতি আদেশ হইয়াছে, তাঁহার কন্যা শ্রীমতী লক্ষ্মীরূপিণী। তাঁহার শয়নকক্ষে যে বাঁশী পাওয়া গিয়াছে, তাহার জন্য

তিনি বা তাঁহার কন্যা কেহই দায়ী নহেন।' গোপালই স্বয়ং দায়ী।

ব্রাহ্মণ চমকিয়া উঠিলেন, তাঁহার অঙ্গে শীতল স্বেদবিন্দু দেখা দিতে লাগিল। তিনি অপগত-চেতন হইয়া মর্ম্মরহর্ম্ম্যতলে বিলুণ্ঠিত হইলেন। রাজার আদেশে অনুচরবৃন্দ তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিল। তখন তিনি অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিলেন, "হে মহাপ্রভু, তুমি ধন্য; হে গোপাল তোমার জয় হউক; মা আমার, যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহাই ঘটিল!"

বৃদ্ধ উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "আমাকে তবে গৃহে যাইবার অনুমতি দেওয়া হউক।"

রাজা বলিলেন, "আপনি স্বাধীন, আপনার জন্য যান প্রস্তুত করিবার আদেশ দিয়াছি। কিন্তু একটু অপেক্ষা করিতে হইবে, স্বপ্নে আমার প্রতি ভগবান যে আদেশ করিয়াছেন, তাহা পালন করিবার জন্য আমাকে প্রস্তুত হইতে হইবে। আমি আপনার নিকট সেই অবসর ভিক্ষা করিতেছি। আমি রাজোচিত উৎসবে লক্ষ্মী দেবীকে গোপালের পার্শ্বে রাখিয়া আসিব, ইহাই আমার প্রতি আদেশ।"

যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদের বিপরীত আকর্ষণে বৃদ্ধের হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম করিল, তিনি সমস্ত শক্তি দিয়া রাজাকে বাহুপাশে বদ্ধ করিলেন। তাহা না হইলে, তিনি ভূতলে পতিত হইতেন।

বিপুল সাজ-সজ্জা করিতে রাজার অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। বৃদ্ধ পুরোহিত গৃহে ফিরিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার আগ্রহাতিশয্যে, বাধ্য হইয়া রাজা তাঁহাকে সমাদরে পূর্ব্বেই রওনা করিয়া দিলেন। রাজা স্বয়ং অগণিত অনুচর সঙ্গে লইয়া অপরাহ্ণে শোভা-যাত্রা করিলেন। সুসজ্জিত হস্তিপৃষ্ঠে রাজা স্বয়ং আসীন হইলেন। তাঁহার পুরোভাগে বিচিত্র কারু-কার্য্যশোভিত স্বর্ণ চতুর্দ্দোলা স্নানপূত বাহকগণ কর্ত্তৃক বাহিত হইল, তাহার উপরিভাগে রৌপ্যদণ্ড-বিলগ্ন স্বর্ণখচিত চন্দ্রাতপ আস্তৃত ছিল। বস্তুত সেই বহুদূরবিস্তৃত শোভাযাত্রায় রাজ-প্রাসাদের শ্রেষ্ঠ বিভব সকল আহরিত হইয়াছিল। আজ যে শ্রীরাধিকার বিবাহোসব!

প্রদোষে যখন গোপালের আরতির বাদ্য বাজিয়া উঠিল, তখন সেই বিপুল রাজসনাথ শোভাযাত্রা মন্দিরদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। জনমণ্ডলী বাহিরের প্রাঙ্গণে, অরুণস্তম্ভ বেষ্টিত করিয়া ও রাজপথে বহুদূর ব্যাপিয়া প্রকাণ্ড অজগরের ন্যায় রহিল। বাদকদল বাদ্যোদ্যমে সে পল্লীকে বধির করিয়া তুলিল। রাজা হস্তী হইতে অবতরণ করিয়া পার্শ্বরক্ষিগণসহ মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। সশস্ত্র প্রহরীরা জনতার প্রবাহ প্রতিহত করিয়া দ্বারদেশে অচলবৎ দণ্ডায়মান হইল।

রাজা সাষ্টাঙ্গে দেবতার সম্মুখে প্রণত হইলেন। বেদী

হইতে পুরোহিত নামিয়া আসিয়া রাজাকে চন্দন, তুলসী ও নির্ম্মাল্য দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। রাজা যখন মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, তখন বৃদ্ধ পুরোহিত তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য অগ্রসর হইয়া আসিলেন। রাজা ব্রাহ্মণের পদধূলি গ্রহণ করিলেন; বলিলেন, "আপনি ধন্য, আপনার কুল পবিত্র হইল।"

পুরোহিত আনন্দে গদগদস্বরে বলিলেন, "মহারাজ, মা আমার আজ পুলকে অধীরা হইয়াছেন। আজ সে সুন্দর মুখে স্বর্গের জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিয়াছে। এমন কখনও দেখি নাই। মানুষের চক্ষুতে যাহা দেখা যায় না, আমি আজ তাহাই দেখিয়াছি। মহারাজ, আমার ভব-বন্ধন টুটিয়া গিয়াছে।" বৃদ্ধ আনন্দে কাঁদিয়া ফেলিলেন।

বৃদ্ধপুরোহিতকে পুরোভাগে লইয়া, চতুর্দ্দোলা সঙ্গে করিয়া রাজা বকুলকুঞ্জের দিকে অগ্রসর হইলেন।, রাজার ইঙ্গিতে জনসঙ্ঘ প্রতিরুদ্ধ হইল। বাদকদল কেবল অনুবর্ত্তী হইল।

রাসপূর্ণিমার রজনী। মেঘমুক্ত নীলগগনে শারদ জ্যোৎস্না রজত বন্যা বহাইতেছে। বকুলকুঞ্জ কুসুমগন্ধে বিভোর। যেন আনন্দের এক মহাপ্লাবন দিগ্‌দিগন্তে ছুটিয়া চলিয়াছে। উল্লাস-দৃপ্ত রাজার কর্ণে গৌরবের দুন্দুভি নিনাদিত হইতেছিল। আর

ভববন্ধনমুক্ত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের আত্মা যেন উল্লাসের গীত গাহিয়া গাহিয়া পিঞ্জরগাত্রে পথের অন্বেষণ করিতেছিল।

ব্রাহ্মণের আঙ্গিনা শুভ্র চন্দ্রকিরণে প্লাবিত। চন্দন গুগ্‌গুল-ধূপ গন্ধে সে স্থানের পবন সুরভিত, পবিত্র, স্নিগ্ধ। ব্রাহ্মণ অতিথির সৎকার ভুলিয়া গেলেন, তিনি একেবারে তাঁহার কন্যার শয়ন-কক্ষে যাইয়া উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন কক্ষ শূন্য—দীপাধারে ঘৃতপ্রদীপ জ্বলিতেছে। ব্রাহ্মণ ত্রস্তব্যস্ত ভাবে ডাকিলেন, "শ্রীমতী।"

তমাল-তল হইতে উত্তর আসিল, "যাই, বাবা।"

ব্রাহ্মণ আবার ডাকিলেন, "শীঘ্র এস, মা, রাজা তোমাকে লইতে আসিয়াছেন। আজ যে তোমার বিবাহ।"

ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর আসিল, "স্বয়ং গোপাল আমাকে লইতে আসিয়াছেন, বাবা, যা—ই।"

ঠিক সেই সময় বিনা আদেশে অসংখ্য বাদ্যযন্ত্র ধ্বনিত হইল। সানাইএর মধুর তান দিগ্‌দিগন্তে এই চিরপ্রেম-মিলন প্রচারিত করিল। অগুরুগন্ধে দেশ ভরিয়া গেল। জ্যোৎস্না শতগুণ উজ্জ্বল ও স্নিগ্ধ হইয়া উঠিল। বকুলকুঞ্জের অপর দিক হইতে অসংখ্য কণ্ঠে যুগপৎ জয়ধ্বনি উঠিয়া গগনে মিশাইয়া গেল।

রাজা যুক্তকরে তমালতলে উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন, অপার্থিব রূপরাশি ধরার বক্ষ উজ্জ্বল করিয়া রহিয়াছে। শ্রীমতীর

প্রাণশূন্য দেহের উপর তমালপত্রের ছায়া জ্যোৎস্নার সঙ্গে মিশিয়া অপূর্ব্ব আস্তরণ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে। তাহার বিস্রস্ত কৃষ্ণ কেশরাজিতে অজস্র শুভ্র কুসুম ফুটিয়া রহিয়াছে। আর তাহার অধরে চিরমধুর হাস্য মুদ্রিত হইয়া আছে।*

* সাক্ষিগোপালের আখ্যায়িকা অবলম্বনে এই গল্পটি লিখিত। যাঁহারা সাক্ষিগোপালের বিগ্রহ দেখিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, গোপালের রাধিকা উৎকল-রমণী। প্রবাদ এই যে, কৃষ্ণপ্রণয়িনী উৎকল-বাসিনীর দেহত্যাগের পর রাজা দৈববাণীর নির্দ্দেশানুসারে তাঁহার অষ্টধাতুনির্ম্মিত প্রতিকৃতি গোপালের বামে স্থাপিত করেন।